বর্ষ ৩, সংখ্যা ২, জুন - জুলাই ২০১৪ মূল্য ₹১০
Vol.3, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2014, Price ₹10 only

প্রভুবার্তা

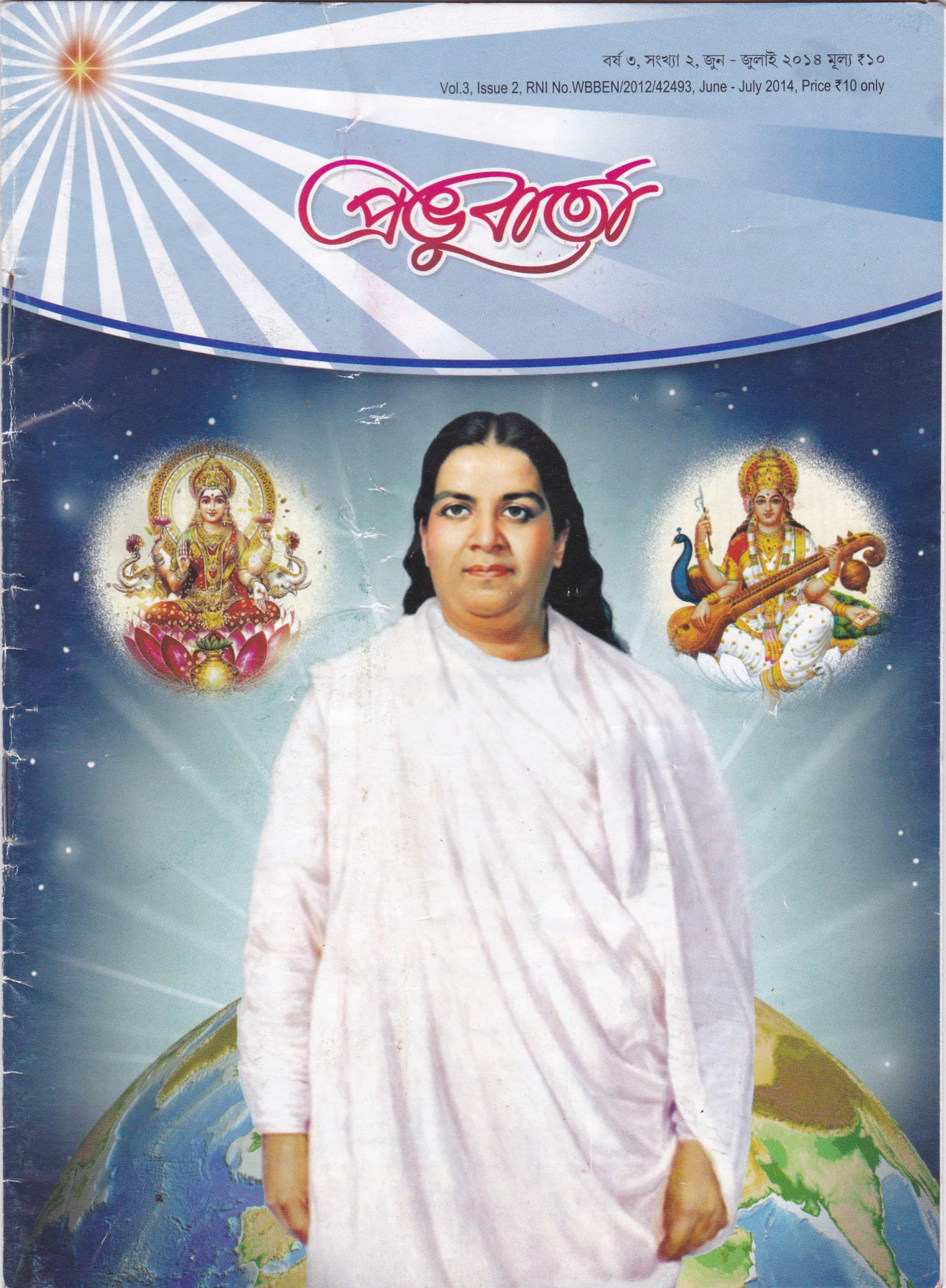

Vol.3, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2014, Price ₹10 only

গুয়াহাটি ঃ (বামদিকে) **বারলুমুখে** নূতন সেন্টার উদ্বোধন করছেন বি. কে. কানন ও বি. কে. শীলা। (ডানদিকে) **রূপনগরে** বি. কে. টিচারদের সঙ্গে বি. কে. শীলা ও বি. কে. কানন।

বহরমপুর ঃ প্রাক্তন ভারতীয় রেল প্রতিমন্ত্রী ভ্রাতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে ঈশ্বরীয় উপহার দিচ্ছেন বি. কে. রমন।

বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া সেবাকেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভগিনী শম্পা দরিপা, চেয়ার-পার্সন, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি সঙ্গে বি. কে. শেফালী ও অন্যান্যরা।

নিরসা ঃ (বামদিকে) 'বিশ্বশান্তি দিবসে' ভ্রাতা পবন কুমার সিংকে ঈশ্বরীয় উপহার প্রদান করছেন বি. কে. শক্তি ও ডঃ অবন্তিকা। (ডানদিকে) ত্রি-দিবসীয় রাজযোগ শিবির উদ্বোধন করছেন বি. কে. স্বামীনাথন, বি. কে. মুন্নি ও অন্যান্যরা।

কলকাতাঃ মহিলাদের জন্য "স্ট্রেস্ ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বি. কে. মাধুরী সঙ্গে বি. কে. চন্দ্রা ও বি. কে. মুন্নি।

তাওয়াং ঃ ঈশ্বরীয় সন্দেশ দানের পর সেনা অফিসারদের সাথে বি. কে. কানন।

সম্পাদকীয়

একদিকে প্রকৃতির দহন জ্বালার ভিতর প্রাণীজগতের অসহনীয় কাতর অবস্থা - তার সঙ্গে মনুষ্যকুলের অপেক্ষাকৃত নমনীয় ও সংবেদনশীল নারীজাতির উপর ইদানীংকালে ক্রমবর্ধমান কামরিপুর বশবর্তী হয়ে নৃশংস অত্যাচার কাহিনি আমাদের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এ-অত্যাচার, এ-নারকীয় কাণ্ড কোন বিশেষ জায়গার ভিতর সীমাবদ্ধ নেই। নৃশংসতার নাম জড়িয়ে গিয়েছে মুম্বাই, দিল্লী এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, কামদুনী ইত্যাদি জায়গার ঘটনাসমূহও। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অধিক নমনীয় নারীজাতিকে ও একইসঙ্গে শিশুদের রক্ষা করার দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক শারীরিক শক্তির অধিকারী পুরুষশ্রেণির উপর বর্তায়। কিন্তু কাম, ক্রোধ, আদি ষড়রিপুর বশবর্তী হ'তে হ'তে বর্তমান সময়ে মানুষের আচরণ মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও অধম হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে মাত্র ১৫০ বছর আগেও, আমরা শুনেছি, রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের পরমারাধ্যা সারদা মায়ের কথা - যখন জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর আসার পথে জঙ্গলে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে ডাকাতদলের হাতে পড়েন, স্বল্পবয়স্কা সারদা মাতা বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে তিনি ডাকাত সর্দারকে 'বাবা' সম্বোধন করেন সহজ সরল ভাষায়। তাঁর কোনরকম ক্ষতি না করে সেই ডাকাত সর্দারই পরম স্নেহে ও যত্নে তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিল। কী সেই দৃষ্টি, কী সেই অভিব্যক্তি, কী সেই বোল, যা' নিষ্ঠুর ডাকাত সর্দার ও তাদের দলের সবাইকে প্রভাবিত করেছিল? - 'পবিত্রতা'। পবিত্রতার শক্তির কাছে মাথা নত করেছিল সমস্ত শারীরিক শক্তি - এমনকি নিষ্ঠুরতাও। কলিযুগে মানুষের অধঃপতনের মূলকারণ হল এই পবিত্রতাকে বুঝতে না-পারা এবং ভুলে যাওয়া। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় যা স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলচালিকা শক্তিই হল 'পবিত্রতা'। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই 'পবিত্রতা' শক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা গিয়েছে 'মাম্মা'কে। স্বল্পবয়স্কা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সেই কন্যাকে দেখা গিয়েছে অকুতোভয়ে ভরা আদালতে বিচারক এবং বিপক্ষের উকিল আদির তোলা 'ওম্ মণ্ডলীর' বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ এক-এক করে স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করতে।

প্রখর তাপের ভিতরেও ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারীগণ গহন তপস্যারত, তাঁদের হৃদয়ের অতি স্নেহী, অতি প্রিয় সেই অত্যাশ্চর্য জীবাত্মার স্মরণে, যিনি কুমারী হয়েও তাঁর গুণাবলীর ও কর্মাবলীর মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন 'যজ্ঞমাতা'। স্বয়ং পরমাত্মা স্নেহভরে তাঁকে 'মাম্মা' বলেই সম্বোধন করতেন এবং তাঁর মুরলী পরিবেশনের সময়েও বারবার তাঁর নাম উঠে এসেছে পরমপিতার ভালবাসাভরা উল্লেখে। ২৪শে জুন, ১৯৬৫ (ইং) তিনি তাঁর অতীতের সমস্ত কর্মের হিসাবকিতাব চুক্তু করে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করেছিলেন।

মাম্মার শ্রেষ্ঠতার একটা প্রধান কারণ যেটা আমরা তাঁর মুখকমল নিঃসৃত বাণী থেকেই পাই " বাবানে কহা - অর ম্যায়নে কিয়া।" প্রথমতঃ মাম্মার সম্পূর্ণ সমর্পণময়তা ও দ্বিতীয়তঃ বাবার সংকল্পের সঙ্গে একাগ্রতা। বাবা কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর 'হাঁজি'। বলা-শোনা-অ্যাক্শন্ - এর ভিতর কোন অবসর নেই, তৎক্ষণাৎ। বাবা সব সময় সাইলেন্স শক্তির কথা বলেন, সাইলেন্স শক্তির মহিমা করেন। এসবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাম্মা। আসুন, আমরা সবাই জুন মাস ব্যাপী প্রবল তপস্যার ভিতর দিয়ে মাম্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই।

- ব্রহ্মাকুমার সমীর

অমৃত সূচি

১।	সম্পাদকীয়	১
২।	সঞ্জীবনী বুটি	২
৩।	তপস্যার ফল	৩
৪।	ঈশ্বরীয় মহান কর্মে আদর্শ দায়বদ্ধতা	৪
৫।	সহনশীলতা	৫
৬।	মাম্মার কাছে স্থিরতা শিখেছি	৬
৭।	ব্রহ্মাকুমারী সংস্থায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি	৮
৮।	আদিদেব	৯
৯।	আধ্যাত্মিক জ্ঞান অধ্যয়ন আবশ্যক	১১
১০।	স্বপ্ন হল সত্য	১২
১১।	পশুহত্যা নিষ্ঠুরতা	১৩
১২।	পেশার প্রসঙ্গ ও বাবার শিক্ষা	১৫
১৩।	বাবাকে চেনার আলোকে মাম্মাকে চেনা	১৭
১৪।	গীতার ভগবান ভারতে এসেছেন	১৯
১৫।	চলো যাই পরমধাম	২১
১৬।	ষোলকলা সম্পন্ন হ'তে	২৩
১৭।	তুমি এসেছ	২৪

নতুন বাংলা বানান বিধি অনুসৃত

Important Information :
All Email communications for this Bengali Magazine (Prabhubarta) must be sent to **bm@bkprabhubarta.org** only
Phone : 033-2475 3521
033-2474 5251
Annual Subscription : ₹60/-

প্রচ্ছদ পরিচিতি

অপবিত্রতার অন্ধকার থেকে সংসারকে আলোকিত করতে জ্ঞানসূর্য ভগবান 'শিব' জ্ঞানচন্দ্রের সাথে জ্ঞানতারকাও রচনা করেন। 'রাধে' নামে পরিচিতা এক কিশোরী ঈশ্বরের কোল নিয়ে বিবর্তনের পথ বেয়ে হয়ে উঠলেন 'ওম্ রাধে' ও জ্ঞানতারকা 'মাতেশ্বরী জগদম্বা সরস্বতী', জগৎ সংসারের মা 'মাম্মা'। ইনিই জ্ঞানদেবী ও ধনদেবী রূপে পূজিতা হন।

সঞ্জীবনী বুটি

সেবায় সফলতার মূল হ'ল সেবাধারীর নিঃস্বার্থ ও নির্বিকল্প স্থিতি। এরূপ স্থিতিতে সেবাধারী তার সেবায় নিজে যেমন সন্তুষ্ট থাকে তেমনি অন্যেরাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়। সংগঠনে অনেক কথা, অনেক মত থাকবে কিন্তু 'অনেক'-এর মাঝে পড়ে নাজেহাল হয়ো না। নিঃস্বার্থ ও নির্বিকল্প ভাব দ্বারা সিদ্ধান্ত নাও, দেখবে অন্যের ব্যর্থ সংকল্প আসবে না , আর তুমিও সফল হবে।

সঞ্জয়ের কলম থেকে....

তপস্যার ফল

যিনি তপস্বী তাঁর চেহারা, তাঁর চোখ দেখেই বোঝা যাবে তিনি তপস্বী। যার যেমন স্মৃতি তার তেমন বৃত্তি হয়, তার ব্যক্তিত্ব সবার সামনে স্বতঃই প্রকাশ পায়। যিনি শিববাবার স্মরণে বিভোর থাকেন তাঁর চোখ, তাঁর স্মিত হাসি, তাঁর চেহারার ঝলক, মুখের বাণী এবং ব্যবহারে খুব সহজেই তা ধরা পড়ে।

'প্রকৃত স্বরূপ' কেবল জ্ঞান দান করলেই প্রকট হবে না। জ্ঞানের পাঠ তো আলাদা, যেখানে পরমাত্মা, আত্মা, সৃষ্টিচক্রের পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের অনুভব হবে আমি 'যোগ' শিখেছি তখনি, যখন যোগ দ্বারা আমার অনেক পরিবর্তন হবে।

আমরা কাউকে ভিজিটিং কার্ড দিই, কার্ড দেখলেই বুঝতে পারে আমার যোগ্যতা কী, শিক্ষা কতখানি, ঠিক এরকমই আমাদের চেহারা ও ব্যক্তিত্ব হ'ল আমাদের ভিজিটিং কার্ড। মুখে কিছু বলি বা না-বলি আমার চেহারা আমার ব্যক্তিত্ব আমার সম্বন্ধে সব বলে দেবে।

ব্রহ্মাবাবার জীবন কাহিনিতে পাওয়া যায়, শত শত লোকের মধ্যে গেলেও বাবাকে সহজেই আলাদা করা যেত। মানুষের দৃষ্টি তাঁর দিকেই পড়ত। বোঝা যেত ইনি বিশেষ ব্যক্তি। মাম্মা ও বাবাকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের এরকম অনুভব হয়েছে। আমিও আমার জীবনে অনেক মহাত্মাকে, অনেক মাতাকে দেখেছি কিন্তু তাঁদের সাথে মাম্মা-বাবার তুলনাই হয় না। মাম্মা-বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। মাম্মার চলন, বলন, উপবেশন, তাঁর চেহারা দেখে আপনি শুধু কেন, যে কেউ খুব সহজেই অনুভব করতেন ইনি সাধারণ নন, অসাধারণ।

আমি বহুবার এরকম ঘটনার সাক্ষী, অনেক বড় বড় ব্যক্তিকে বিরোধিতা করতে দেখেছি, যতক্ষণ না তাঁর মাম্মার সামনে এসেছেন। যেই তাঁরা মাম্মার সামনে এসেছেন, কথা বলেছেন সব কিছু জল হয়ে গেছে। তাঁদের মানসিকতা বদলে গেছে।

কোন ব্যক্তি মাম্মা-বাবার ক্লাসে এক পলের জন্যেও এলে তাঁদের অনুভব হয়েছে এঁনারা বিশ্বজন। বিদেশি বহু ভাইবোন তাঁদের অনুভবে শুনিয়েছেন, মাম্মা-বাবার চিত্র দেখতে দেখতে অশরীরী স্থিতি তারা লাভ করেছেন। মোদ্দা কথা এটাই হল 'তপস্যার ফল' যা সবচেয়ে বড় সেবা।

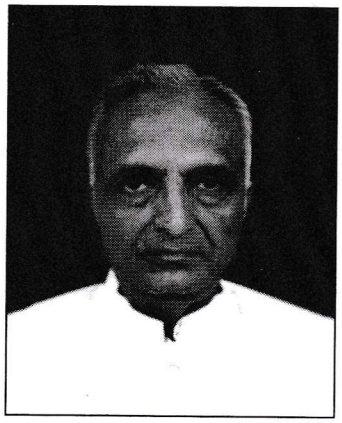

ঈশ্বরীয় মহান কর্মে আদর্শ দায়বদ্ধতা

- ব্রহ্মাকুমার রমেশ শাহ
মুম্বাই (গামদেবী)

আমরা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী সন্তান তাই শিববাবা আমাদের বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ বলেন। বর্ণের প্রকার ভেদ বর্তমান দুনিয়াতেও চলে আসছে। বর্তমান সময়েও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র - এই চার বর্ণের উপস্থিতি আছে। লৌকিক দুনিয়াতেও ব্রাহ্মণের প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়; যেমন ঃ

১। ঋষি ব্রাহ্মণ - হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ শিখরে এঁদের স্থান।

২। রাজা ব্রাহ্মণ - যেমন কণও বংশ ব্রাহ্মণ বংশ ছিল। এই বংশের আদি স্থাপক কণও ঋষি। ওই সময় এই বংশের রাজারা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করতেন। মহারাষ্ট্রে যে পেশোয়ারা রাজত্ব করতেন তাঁরা এই বংশের ছিলেন।

৩। আচার্য ব্রাহ্মণ - শঙ্করাচার্য, মাধ্বাচার্য আদি আচার্যগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই আচার্য ব্রাহ্মণগণ জৈন ধর্মের জন্য দর্শনশাস্ত্র লিখেছিলেন। এক হাসির কথা, নাস্তিক চিন্তাধারার আচার্য চার্বাক এই আচার্য ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর ছিলেন।

৪। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ - বাচস্পতি মিশ্র তথা মণ্ডন মিশ্র এরকম হাজার সংখ্যার পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আছেন।

৫। মন্ত্রী ব্রাহ্মণ - এরূপ ব্রাহ্মণ রাজাদের নিকটে পরামর্শদাতা কিংবা মন্ত্রীরূপে বিরাজ করতেন। যেমন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় আচার্য চাণক্য ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় ইচ্ছা রেখে চন্দ্রগুপ্তকে রাজা হতে সাহায্য করেছিলেন এবং রাজনীতির উপর অনেক রকম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৬। সাহিত্যিক ব্রাহ্মণ - এই পর্যায়ে অনেক ঋষি আছেন, যেমন, বাল্মীকি, কালিদাস প্রমুখ। এঁরা বিশ্বসাহিত্যে উৎকৃষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

৭। কবর খননকারী ব্রাহ্মণ - এ ধরনের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কিছু কিছু স্থানে দেখা যেত বিশেষ করে মুসলিম রাজাদের আমলে এঁদের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। যেখানে যেখানে মুসলমান রাজারা যুদ্ধ করেছেন সেখানে তাঁদের সাথিদের কবরস্থ করার জন্য এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাজাদের সাথে যেতেন এবং সহযোগিতা করতেন।

৮। রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণ - এই ব্রাহ্মণগণ রাজার অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে রাজকারবার সামলানোর জন্য বিভাগীয় মুখ্যরূপে কাজ করতেন। রাজারা এসব ব্রাহ্মণদের বিশেষ কদর করতেন।

৯। কিষাণ ব্রাহ্মণ - কৃষিকাজ করা ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় এঁদের নাম উল্লেখ আছে। এধরনের ব্রাহ্মণ নিজে চাষ করে ফসল ফলিয়ে নিজের উদরপূর্তি করতেন। চাষের দ্বারা অনেক কাজ করতেন। যেমন রাজা জনকের হাল চালনার সময় সীতার জন্ম হয়েছিল মাটি থেকে। আবার তিনি অন্তিমে ভূমি মাতার কোলেই স্থান নিয়েছিলেন।

১০। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ - এ ধরনের ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের লোকাচার সম্পন্ন করে দেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবাহ সম্পন্ন করা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ ইত্যাদি।

১১। ন্যায়াধীশ ব্রাহ্মণ - এধরনের ব্রাহ্মণ বিচার ব্যবস্থা সামলাতেন। পেশোয়াদের রাজত্বকালে রামশাস্ত্রী নামক এরূপ প্রসিদ্ধ ন্যায়মূর্তি ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজারাজরা যুদ্ধ ও রাজকারবার সামলাতে ব্যস্ত থাকতেন, আর ন্যায় বিচারের দায়িত্ব এসব ব্রাহ্মণেরা সামলাতেন।

এধরনের বিশেষ এগারো প্রকার ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করলাম। আমাদের দৈবী পরিবারে ব্রাহ্মণদেরও নিয়ে নতুন ভাবে লেখা উচিত। 'দৈবী ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ প্রজাপিতা

> *'দৈবী ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা পরমাত্মার জন্ম দেওয়া 'ব্রাহ্মণ'। এরূপ দৈবীকুলের ব্রাহ্মণ কেবল সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে।*

ব্রহ্মার মুখের দ্বারা পরমাত্মার জন্ম দেওয়া 'ব্রাহ্মণ'। এরূপ দৈবীকুলের ব্রাহ্মণ কেবল সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ শব্দের বিস্তারে এজন্য যেতে হয় কারণ যজ্ঞে বহুবিধ কাজকারবারের বিভাজন প্রয়োজন হয় সুষ্ঠভাবে যজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যজ্ঞের সূচনা থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সঞ্চালন এবং পরমাত্মার অবতরণ দ্বারা ঈশ্বরীয় জ্ঞানদানের আধ্যাত্মিক মহান কর্ম এই উভয়ই বিষয় ব্রহ্মাবাবার হাতেই ন্যস্ত ছিল। পরবর্তী কালে দায়িত্ব বিভাজিত হল। দাদি প্রকাশমণি এবং দিদি মনমোহিনী আদি যজ্ঞের বিভিন্ন বিষয় সামলালেন আর গুলজার দাদির দ্বারা পরমাত্মার দিব্য অবতরণ তথা জ্ঞানদানের মহান কর্ম হতে লাগল।

সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে সূচনাতে ব্রহ্মাঋষি ও রাজঋষি উভয়ের স্বরূপ এক হবে। যেমন বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল রূপ। ঠিক এরকম সত্যযুগে রাজঋষি তথা ব্রহ্মাঋষি এই দুজনার কাজ একজনের দ্বারাই হবে। পরবর্তী কালে কাজের ভিত্তিতে বিভাজন হয়। জ্ঞান দেওয়ার কাজ ব্রহ্মাঋষি সম্পাদন করবেন এবং রাজকারবার সঞ্চালনের কাজ রাজঋষি অর্থাৎ মহারাজা করবেন। গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, মোজেস - এঁরা সব রাজপরিবারে ছিলেন। রাজপরিবারে জন্ম নিয়েই এঁরা রাজঋষি থেকে ব্রহ্মাঋষি হন।

সহনশীলতা

এক জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোককল্যাণে উপদেশ দান করেন। একদিন উপদেশে তিনি বলছিলেন - "ধরিত্রী মায়ের মতো প্রত্যেকের সহনশীল ও ক্ষমাশীল হওয়া চাই। ক্রোধ এমন অগ্নি যা অন্যকে জ্বালায় আবার নিজেকেও জ্বালায়।" সভায় উপস্থিত সকলে শান্তিতে প্রবীণের উপদেশ শুনছিলেন। ব্যতিক্রমী একজন ছিলেন। প্রবীণের উপদেশ তার মোটেই ভালো লাগেনি। উপরন্তু তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলতে লাগলেন - " ভণ্ড, লম্বা-চওড়া কথা বলাই তোমার কাজ, লোককে ভুল বোঝাচ্ছ, বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব কথার দু-পয়সাও দাম নেই।" এরূপ কটুকথা শুনে প্রবীণ শান্ত রইলেন, তাঁর কোন দুঃখ হল না আর কোন প্রতিক্রিয়াও হল না। এতে ওই ব্যক্তি আরো রেগে গেলেন। প্রবীণের গায়ে থুথু ছিটিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

পরের দিন ওই ব্যক্তির রাগ যখন পড়ে গেল তখন সে নিজের কু-ব্যবহারের জন্য অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে লাগল। ওই প্রবীণের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অন্য আর একটি গ্রামে তার দেখা মিলল। ভাষণরত প্রবীণের পায়ের উপর পড়ে বারংবার ক্ষমা চাইল। বলল - "প্রভু, আপনি আমাকে মাফ করুন।" প্রবীণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আপনি ভাই? কেন ক্ষমা চাইছেন?" ওই ব্যক্তি বললেন, "ভুলে গেলেন, আমিই কাল আপনার সাথে ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেছি, আমি দারুণ লজ্জিত।" প্রবীণ প্রেমপূর্বক স্নেহের সুরে বললেন, "চলে যাওয়া 'কাল'কে আমি ওখানেই ফেলে এসেছি, আপনি সেই কাল-এ আটকে আছেন? আপনি নিজের ভুল বুঝতে পরেছেন, অনুশোচনা হয়েছে, ব্যাস্, আপনি নির্মল হয়ে গেছেন। অতএব এখন 'আজ'-এ প্রবেশ করুন। অতীতের কুদিন, কুব্যবহার মনে আনলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই দূষিত হয়ে যাবে। সুতরাং তা না করাই ভালো। ওই ব্যক্তির মন থেকে সমস্ত বোঝা হালকা হল। প্রবীণের চরণ ছুঁয়ে ক্রোধ ত্যাগ করে সহনশীলতার ব্রত ধারণ করার প্রতিজ্ঞা করল। প্রবীণ তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

মাম্মার কাছে স্থিরতা শিখেছি

- রাজযোগিনী দাদি জানকী

মাম্মা মিঠা হলেন কীভাবে? ১৭ বছর বয়সে তিনি যজ্ঞে এলেন। এত মিঠা হয়েছেন, একজন কুমারীকে আমরা 'মা' বলতে লাগলাম, ওম্ রাধে থেকে সরস্বতী হয়ে গেলেন। যজ্ঞমাতা থেকে জগৎমাতা, এরপর হলেন লক্ষ্মী। পুষ্পশান্তা দাদি মাম্মার মধ্যে লক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পর দাদি পুষ্পশান্ত নিজেকে যজ্ঞে অর্পণ করেছিলেন। মাম্মার বাণী তাঁর মর্মে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে যজ্ঞে নির্দ্বিধায় এক লহমায় সমর্পিত হয়েছিলেন।

আমি তো এসেছিলাম মাম্মার কাছে থাকবো বলে কিন্তু আমাকে রাখা হয়েছিল বাচ্চাদের সামলানোর জন্য বাচ্চাদের কাছে। চল্লিশটি বাচ্চার দেখভাল করার জন্য আমাকে 'শিশু ভবন'-এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিন রাত ১০টায় দেখি সব দাদি এবং মাম্মা আধ্যাত্মিক আলাপচারিতায় মগ্ন। আমি মাম্মাকে বললাম, আমাকে শিশুভবনে রাখা হয়েছে, আপনার কাছে নয় কেন? মাম্মা বললেন, তুমি জনক না, তবে কেন বলছ ওখানে কেন রাখা হয়েছে? মাম্মা আমার 'স্বমান' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দেড় বছর বাচ্চাদের সাথে ছিলাম, অনেক উন্নতি হয়েছিল। মাম্মাই প্রথম, যিনি আমাকে 'জনক' বলেছিলেন। আমি যখন যজ্ঞে এলাম তখন আমার সাথে একটা শাল ছিল। আমি লৌকিক পরিজনকে সেই শাল আমার শরীর থেকে খুলে দিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমার পরিচয় দেওয়া হয় 'মোস্ট স্টেবল মাইন্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' (সংসারে স্থিরতম মনের অধিকারী) আজ হৃদয় দিয়ে স্বীকার করছি, এই গুণ আমি মাম্মার কাছ থেকে শিখেছি। আমি মাম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি এত নিশ্চিন্ত, গম্ভীর কীভাবে থাকেন, এক কম বলেন অথচ যজ্ঞে সবকিছু অ্যাকুরেট চলছে, মন এরকম কীভাবে রাখেন? তিনি বলেছিলেন, মন আমার বেবি, একে হাসাও, দমিও না। সংকল্প এমন কর যাতে শান্তি পরিপূর্ণ থাকে। মাম্মার কথা হৃদয় দিয়ে মেনে নিয়েছিলাম এবং শিখে নিয়েছি। মাম্মা 'বাবা' বলতেন, এই বলার মধ্যেই ছিল ভীষণ 'রিগার্ড'। বাবা কলিফ্টন থেকে টেলিফোনে মাম্মাকে মুরলী শোনাতেন। কী অদ্ভুত! মাম্মা ওই মুরলী হুবহু রিপিট করে শোনাতেন। আমি মাম্মাকে কখনও নোট করতে দেখেনি। সরাসরি তিনি হৃদয়ে গেঁথে নিতেন। মাম্মা চাইতেন বাবা যেন তাঁকে 'মাম্মা' বলে না ডাকেন। কিন্তু কী বলব বাবাই প্রথম প্রথম 'মাম্মা' বলা শুরু করেছেন। আমি প্রতি পলে মাম্মা-বাবার কাছ থেকে বহু কিছু শিখেছি।

বাবা মুরলীতে জগদম্বার দারুণ মহিমা করেছেন। বাবা বলতেন, মাম্মার পুরুষার্থে বিন্দুমাত্র অবহেলা কিংবা রয়্যাল অলসতা ছিল না। মাম্মার মধ্যে আত্মিক ভাব এবং ঈশ্বরের প্রতি অসীম প্রেম ছিল। কখনই মনে হত না তিনি কিছু করছেন বা করিয়ে নিচ্ছেন। মাম্মার উপস্থিতিতে সবাই সটান দাঁড়িয়ে যেত। দুপুর ১২টায় ভাণ্ডারে আসতেন, এক মিনিটও বিলম্ব হত না। কারণ বাবার নির্দেশ ছিল ১২টার সময় ভোজনের ঘণ্টা যেন অবশ্যই বাজে। বাবার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মাম্মা দেখিয়েছেন। বাবা এও বলেছেন, 'ল এন্ড অর্ডারে' সত্যযুগে রাজ্য চলবে। মাম্মা তা চালিয়েছেন, তাই তো লক্ষ্মী প্রথমে নারায়ণ পরে। তা নাহলে তো নারায়ণের নামই তো প্রথমে আসা উচিত ছিল। ব্রহ্মাবাবা নিজেকে গুপ্ত রেখে মাম্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন যাতে

'শক্তিসেনা' এগিয়ে যায়।

মাম্মা সময়কে ভীষণ মূল্য দিতেন এজন্য কখনও তাঁর মুখ থেকে এক্সট্রা শব্দ বেরত না। কারোর ত্রুটি কাউকে তিনি শোনাতেন না। যদি কেউ মাম্মাকে শোনাতেন মাম্মা তা নিজের মধ্যে রেখে তাকে সঠিক সমাধান দিয়ে বিষয়টির ইতি টেনে দিতেন। আমরাও যদি মাম্মার মতো একে অপরের প্রতি করি তাহলে প্রভূত উন্নতি হবে। এখনও পর্যন্ত যদি কেউ চান তাহলে নাম্বার ওয়ানে আসতে পারেন। তাহলে করণীয়? পাস্ট ইজ পাস্ট। বিন্দুমাত্র অতীতের কথা চিন্তা করো না। অতীতের কথা চিন্তা করার মানে হল অতীতেই নিজেকে বেঁধে রাখা। যে নাম্বার ওয়ানে আসতে চায় সে সবার কাছ থেকে শেখে। অতএব মা-বাবার আশীর্বাদ নাও আর পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হও। কোন পুরনো পাপ যেন না থাকে তাহলেই নাম্বার ওয়ানে আসতে পারবে।

মাম্মার সববিষয় নিজের ঝুলিতে ভরে নাও, তারপর দেখ, আমি কে? মিঠা মাম্মার ভক্তিতে গায়ন আছে - জগদম্বা, কালী, সরস্বতী, বৈষ্ণব দেবী, মা শীতলা, মা দুর্গা..... এসবের জীবন্ত স্বরূপ মাম্মার মধ্যে দেখেছি। যজ্ঞে তিনি রাধে নাম নিয়ে এসেছেন এবং বাস্তবিকই সত্যযুগীয় রাধার সংস্কার নিয়েই তিনি এসেছিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মী হয়েছিলেন, লক্ষ্মীর সমস্ত লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখেছি। তাঁর কালী রূপ দেখেছি। পুরনো সংস্কার নিয়ে কেউ মাম্মার সামনে গেছেন, সব সংস্কার তার ভস্ম হয়ে গেছে। নামজাদা গৃহস্থ, ভীষণ উগ্র স্বভাবের প্রবীণদেরও তিনি যোগী বানিয়ে ছেড়েছেন।

পুরনো সংস্কার নিয়ে কেউ মাম্মার সামনে গেছেন, সব সংস্কার তার ভস্ম হয়ে গেছে। নামজাদা গৃহস্থ, ভীষণ উগ্র স্বভাবের প্রবীণদেরও তিনি যোগী বানিয়ে ছেড়েছেন।

মাম্মার দৃষ্টি কখনও কোথাও আটকে যায়নি। না খাওয়াতে না পরাতে। মাম্মা কখনও সোয়েটার পরেননি, মাফলারও জড়াননি। এত ঠাণ্ডাতেও তিনি ত্যাগী-তপস্বীমূর্তি ছিলেন। আমরা এরকম মায়ের বাচ্চা। মাম্মার শরীর ত্যাগের পর ভক্তগণ এই মাকে ডাকেন, মাও তাঁদের মনোকামনা পূরণ করে দেন। বাবা বলতেন, মাম্মারও নাম রূপ দেখো না কিন্তু আমরা দেখি আমাদের মা-বাপ কেমন তরো? দুনিয়া যে মায়ের একবার দর্শনের জন্য গলা কাটে আর আমরা সেই মায়ের স্নেহের বাচ্চা, তাঁর দৃষ্টিতে লালন পালন হয়েছি, তাঁর হাতে খেয়েছি। মাম্মা যা যা করেছেন তা সব দেখেছি, তাঁর সাথে পার্ট প্লে করেছি। কতখানি সৌভাগ্যের বিষয়।

মাম্মা কখনও আওয়াজ করে হাসতেন না, তাঁর স্মিতহাসিতে আমরা সব বুঝে যেতাম। যেমন গুলজার দাদি সন্দেশ নিয়ে আসতেন, বাবা স্মিতহাসি হাসতেন, এতেই লেনদেন হয়ে যেত। মাম্মা ভগবতী মা। তিনি বলতেন, সদা সন্তুষ্ট থাকো, শান্ত থাকো। একে অপরকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখো। যেমনভাবে মাম্মা-বাবা আমাদের স্নেহে পালন করেছেন, তোমরাও পরস্পর পরস্পরকে ওইরূপ দেখো। মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার এটাই সময়। মাম্মা প্রত্যেকটি মর্যাদা পালনে অ্যাকুরেট ছিলেন। মাম্মাকে কখনও ফ্যামিলিয়রিটিতে আসতে দেখিনি। মিঠা মাম্মার আমাদের প্রতি আশা, আমরা বাবার বাচ্চারা যেন গোলাপ ফুল হই। তাই আমাদের দৃষ্টি, বৃত্তি, আত্মিক স্থিতিতে পূর্ণ রেখে

বরদানী মায়ের থেকে বরদান নিয়ে নিতে হবে। এরূপ বরদান সদাকালের জন্য কায়েম থাকবে।

যদি কারোর মধ্যে কোন কিছুর ঘাটতি কিংবা দুর্বলতা থাকে তাহলে আজ থেকে তা আর দেখোই না। অন্যের দুর্বলতা দেখলে তা সংক্রামিত হয়ে নিজের মধ্যে এসে যাবে। সুতরাং এই ভুল করা চলে না। কোন না কোন দুর্বলতা কারোর মধ্যে থাকতেই পারে। সেই দুর্বলতাকে বলি দিয়ে দাও। নিজের ভেতরে যদি কোন ঘাটতি-কমতি থাকে তাহলে শীতলা, কালী, দুর্গা, জগৎ অম্বার অনুভব হবে না। জীবনে যতই সমস্যা আসুক না কেন হেলে যেও না, স্থির থাকো। এসব মাম্মা আমাদের শিখিয়েছেন, মাম্মা প্রকৃতপক্ষে কে? আমাদের হাতে-কলমে নির্মাণকারিণী ভগবতী মা। অ্যালার্ট, অ্যাকুরেট, অলরাউন্ডার, এভাররেডি হতে গেলে মুখে শুধু আশ্বাস বাণী শোনালেই হবে না, বাস্তবে স্বরূপ হয়ে প্রমাণ করতে হবে।

ব্রহ্মাকুমারী সংস্থায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি

- ব্রহ্মাকুমার অরুণ
কলকাতা লেকগার্ডেন্স

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সমুদ্রজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি 'রাজযোগ' শিখতে ইচ্ছুক হ'লাম- এই 'রাজযোগ' শব্দ আমায় ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার প্রতি আকর্ষিত করেছিল। একদম দেরি না করে আমি ব্রহ্মাকুমারীর ইষ্টার্ন জোন হেড অফিস, এলগিন রোড কলকাতায় পৌঁছে যাই। সাতদিনের কোর্স শেষ করার পর আমি মুরলী ক্লাস শুনতে থাকি। এক সপ্তাহের ভিতরে আমি আমাদের পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য আদি বিষয়ে সবকিছু জানতে পারি। আমি অনেক আধ্যাত্মিক বই পড়েছিলাম কিন্তু কখনও বুঝতে পারিনি দেবদেবী কারা বা 'শিব' এবং 'শঙ্কর' এর মধ্যে পার্থক্য কী?

যদিও আমার ''মুরলী'' শুনতে খুবই ভালো লাগতো, প্রথম দিন থেকেই কিন্তু 'মুরলী' এবং 'রাজযোগ'-এর ভিতরকার সম্বন্ধটা বুঝতে আমার সময় লেগেছিলো। ছোটবেলা থেকেই আমি জানতাম মন এবং মনের রহস্য বোঝা অত্যন্ত জরুরি। ব্রহ্মাকুমারী সংস্থায় এসে আমি প্রথম জানতে পারলাম মনের বিচারকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং আমি এও জানতে পারলাম নেগেটিভ চিন্তাধারা থেকে অত্যন্ত সতর্ক কীভাবে থাকতে হয়।

কয়েক বছর পর একদিন অমৃতবেলায় যোগের সময় আমার অত্যন্ত সুন্দর অনুভূতি হ'লো। এই প্রথমবার আমি অনুভব করলাম আত্মিক অনুভূতি ও দেহ অনুভূতির মধ্যেকার পার্থক্যকে। সহসা আমার অনুভব হ'লো প্রতিটি আত্মাই ভালো - কারুর মধ্যে আমি কোন দোষ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সমস্যা হল ক্ষণে ক্ষণে দেহবোধ ফিরে আসে। আত্মিক বোধের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন যেটা বাবা তাঁর মুরলীর মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকদিন বলেন।

যখনই কোন সমস্যা আমায় বিব্রত করে, রাত্রে শোবার আগে যোগের সময় আমি তা বাবাকে দিয়ে দিই। প্রথম প্রথম এটা কাজ করেনি। আমি বুঝতে পারলাম এটা 'নিশ্চয় বুদ্ধির' অভাব। কিছুদিন আগেই আমার কাছে দুটো সমস্যা এসেছিলো কিন্তু দুটোই সমাধান হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়বুদ্ধি প্রত্যেকের জন্য আশাতীত কিছু ঘটাতে পারে।

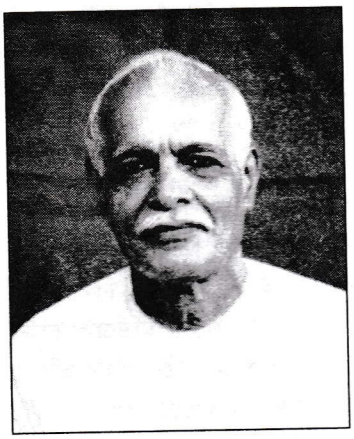

আদিদেব

- ব্রহ্মাকুমার জগদীশচন্দ্র

আমার মা খুব ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং স্বভাবতই তিনি সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন, আমিও দু-একবার সঙ্গে গিয়েছিলাম তবে তা শুধু নাচ, খেলাধূলা ও লম্ফঝম্ফ করার জন্য।

"একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সৎসঙ্গে বসে থাকার সময়, আমি হঠাৎ খুব একাগ্রচিত্ত হয়ে পড়ি। মনে হল কোন এক শক্তি যেন আমার এই অবস্থা করছে। চুম্বকের ন্যায় আকর্ষক, শক্তিশালী ও অতি সুন্দর কোন একজন যেন আমাকে গভীরে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অপার্থিব অনুভূতির জগতে নিয়ে গেল।

"যে সব মহিলা আমার পাশে বসেছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, আমি হয়ত ঘুমচ্ছি। কিন্তু অনেকক্ষণ আমাকে এইভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে তাঁরা বুঝলেন আমি সমাধি অবস্থায় আছি। খুব অল্পই তাঁরা এবিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। আমি অন্য জগতে চলে গেলাম। এই পৃথিবীর অনেক উর্ধ্বে অন্য এক জগতে, অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো যেন ব্যাপারটা। যদিও তা রোমহর্ষক বা ভয়ের কিছু ছিল না।

"আমি একটা বিশাল কক্ষে ছিলাম - যা অতি সুন্দর আর মনোরম। পৃথিবীর কোন সজ্জা ও সৌন্দর্য এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। সেখানে কারুকার্য খচিত সোনা, হিরা ও নানারঙের মণি-মাণিক্য খচিত অলংকার, অতি মিহি পোশাক এবং অতি শুভ্র হিরার বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি; মনোহরণকারী ফল-ফুলের বাগান এবং প্রবহমান শান্তনদীর দৃশ্য যেটা জানালা দিয়ে দেখা যায় - এসবই ছিল।

"সেই বিশাল কক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, বস্তুতঃ আকর্ষণের প্রতীক - ১০ বছর বয়সের রাজপুত্র, সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে ছিলেন। সে আমায় ইশারায় ডাকছে ও বলছে, এস, আমরা খেলা করি।"

"এই দর্শনের পর আমি যখন পার্থিব চেতনার মাঝে ফিরে এলাম, আমি চোখ খুলে দেখলাম, অনেক মহিলা আমার চতুর্দিকে ঘিরে, আমাকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে। আমি হঠাৎ ভয় পেলাম এবং কেঁদে উঠলাম। আমি ভাবলাম, আমার যেন কী হয়েছে কেন এই সব মহিলা আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছেন? কিন্তু আমার মা আমায় শান্ত করলেন এবং স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী দেখেছি?

"কিন্তু প্রকাশ করা সহজ মনে হল না। কেননা, আমি কাকে দেখেছি? অবশ্য পরে আমি জানতে পারি যে, শিশুটি রাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু যখন আমি দর্শনের অভিজ্ঞতার মাঝে ছিলাম, তখন আমি এই সুন্দর রাজপুত্রকে চিনতে পারিনি। আগে আমি কখনও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখিনি এবং তাঁর নাম লোকমুখে শুনলেও তাঁর প্রতি আমার কোনরকম আকর্ষণ হয়নি। সুতরাং সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে যা দেখেছি খুব একটা নিশ্চিত ভাবে স্মরণ করে নাও বলতে পারি। এইটুকু বর্ণনা করতে পারি যে অতি

আদরের ও খুশিতে ভরা এক শিশু, রাজপুত্রের বেশে সজ্জিত হয়ে এক অতি মনোরম রাজপ্রাসাদে - এরকমটি আমি আগে কখনও দেখিনি বা কল্পনাও করিনি - সিংহাসনে বসে আছে। শিশুটি যেন আমাকে চেনে, কেননা, সে ইশারায় আমাকে তার সঙ্গে নাচতে ও খেলা করতে ডাকছিল।

"আমি ঠিক করে বর্ণনা করতে পারিনি; কিন্তু আমার মা, যিনি ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এই শিশুকে শ্রীকৃষ্ণ ব'লে চিনতে পারলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কিছু প্রচলিত ছবি এনে দেখালেন এবং বুঝতে চাইলেন এঁকেই আমি দেখেছি কিনা। কিন্তু সমস্যা হল, চিত্রকর যিনি এই ছবি এঁকেছেন তার তো এরকম দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়নি, কাজেই তার চিত্র যথার্থ বা সঠিক হতে পারে না। আসল শ্রীকৃষ্ণ তো এইসব ছবি বা মূর্তির তুলনায় অনেক গুণ সুন্দর। সুতরাং আমার পক্ষে আমার দেখা শিশু এবং এই ছবির শিশু এক, বলা খুবই কঠিন ছিল। বাহ্যিক কিছু মিল - যেমন, হাতে বাঁশি, পোশাক, এবং স্বর্গ, হিরে ইত্যাদির প্রাচুর্য - এসবের মিল ছিল। অবশেষে আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি এঁকেই দেখেছি, তবে সে আরও অনেক সুন্দর ছিল।"

প্রত্যেক ব্যক্তি - তিনি সমাজের যে স্তরেরই হোন, একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছেন, সব মনুষ্যাত্মার পিতা, যিনি সত্যজ্ঞান দাতা, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত।

ওই সময়ে এধরনের দর্শন অনেক সন্তানদের ও তাদের জ্যেষ্ঠদেরও হয়েছিল। খুবই আনন্দের সময় ছিল সেটা এবং বহু মানুষের সমাগম উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। আনন্দের সীমাও উপরে উঠতে লাগল। যাদের আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিল, যাদের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দৃঢ়তর হয়েছে তারা মনশ্চক্ষুতে হঠাৎ অনাবিল শিল্পসৌন্দর্য ও সৃষ্টিচক্রের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভ্রমণের বিশেষ বরদান পেত। স্থবির পৃথিবীর মাঝে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতার স্ফূরণ ঘটল - যা পৃথিবীর ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা সাধারণ হয়ে উঠল। অসম্ভবও সম্ভব হয়ে উঠল। দেহের অস্তিত্ববোধের বিলুপ্তি ঘটল। সময়ের গণ্ডী হারিয়ে গেল চিরন্তনে। ঈশ্বরের জ্ঞানের আলো অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করতে লাগল।

ক্রমবর্ধমান ঈশ্বরীয় পরিবারের, আনন্দের গান গাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকে। তাঁরা অসংখ্য গান রচনা করলেন এবং হৃদয় উৎসারিত সুর-মূর্চ্ছনার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন - এই গান আনন্দের গান, সম্পূর্ণতা অর্জনের গান, শ্বাসরোধকারী অহংবোধ থেকে মুক্তির গান, প্রেমসাগর শিববাবার গান।

সৎসঙ্গের কাজ শেষ হলে, ব্রহ্মাবাবা সন্তানদের মাঝে হেঁটে যেতেন এবং সকলকে দৃষ্টি দিতেন; সন্তানেরাও বাবার উষ্ণ সান্নিধ্য এবং আপনভাব অনুভব করত। সবাই নিরাপদও নিশ্চিন্ত বোধ করত। প্রত্যেক ব্যক্তি - তিনি সমাজের যে স্তরেরই হোন, একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছেন, সব মনুষ্যাত্মার পিতা, যিনি সত্যজ্ঞান দাতা, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত।

যারা প্রথমবার সৎসঙ্গে এসেছেন, তারাও এই জ্ঞান অনুশীলনকে পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা বলেই বোধ করেছেন। এখানে অন্যরকম জীবন; এখানে আছে আনন্দ, আছে শক্তি। (ক্রমশঃ)

আধ্যাত্মিক জ্ঞান অধ্যয়ন আবশ্যক

- ব্রহ্মাকুমারী ঊষা
আবু পর্বত

ধর, কারুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ডাক্তারের কাছে গেছে আর ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিলেন, দেখুন, যদি আপনাকে বাঁচতে হয় তাহলে আধাঘণ্টা করে প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যায় নিয়ম করে হাঁটতে হবে। একথা শুনে রোগী যদি বলেন, সকালে সময় হবে না, কারণ সারাদিনের সব কাজের আরম্ভ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়, সমস্ত ফোন আসা সকাল থেকেই শুরু হয়। সন্ধ্যাবেলায় দেখব যদি সুযোগ পাই হাঁটব। এর প্রেক্ষিতে ডাক্তার কী বলবেন বা বলতে পারেন? তিনি বলবেন, দেখুন এর বিকল্প আমার কাছে নেই। যদি আপনাকে বাঁচতে হয় তাহলে আপনাকে সময় বের করতেই হবে। যার বাঁচার ইচ্ছা থাকবে সে নিজেই দিনচর্চাকে অদল বদল করে সময়ের ব্যবস্থা করে নেবে। সকাল-সন্ধ্যা মিলে একঘণ্টা বের করে নিলে তার হাঁটার সুযোগ হয়ে যাবে। আর ফোনের কল আসা, তা দু-চারদিন আসতে থাকবে, তারপর কলাররা বুঝে যাবেন; এই সময় তিনি হাঁটতে বের হন। হয় তারা আগে ফোন করবেন কিংবা পরে করবেন, এসব অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার ধান্দার জন্য নিজের জীবনকে কি কেউ নষ্ট করে? মানুষের টনক নড়ে তখনই যখন তার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়।

ঠিক একই কথা প্রযোজ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও। আজকাল চিকিৎসকরাও বলে থাকেন রোগের ৭০ ভাগ কারণ টেন্‌শন্। টেন্‌শন্ থেকে মুক্তি পেতে কিংবা টেন্‌শন্ ফ্রি থাকতে হলে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মানসিক বলকে বাড়ানো জরুরি। মানসিক বলকে যতক্ষণ না বাড়ানো যাবে ততক্ষণ টেন্‌শন্ দূর হবে না। তার ফলস্বরূপ কোন না কোন রোগের সে শিকার হবেই। স্বাস্থ্য সচেতনতা এলে ব্যক্তি অবশ্যই হাঁটার জন্য সময় বের করবেই কিংবা শত ব্যস্ততার মধ্যেও আধঘণ্টা ঘরে বসেই ব্যায়াম করে নেবে।

যে ব্যক্তি কখনই ব্যায়াম করেননি তিনি যদি এক প্রস্থ হেঁটে নেন বা ব্যায়াম করে নেন তার সন্ধ্যাবেলায় কেমন পরিস্থিতি হবে? তার হাত-পা ব্যথা করবে। ব্যথা করলেই কি সে এক্সারসাইজ করা বন্ধ করে দেবে? পরের দিন কি সে এক্সারসাইজ করবে না? সে অবশ্যই বুঝবে যে মাংসপেশির আরামে থাকার অভ্যাসের জন্য ব্যথা হয়েছে। এই ব্যথাকে যে কোন উপায়ে উপশম করিয়ে দ্বিতীয় দিনে আবার সে এক্সারসাইজে লেগে পড়বে। আজ মানুষের জীবনে এত রোগ-ব্যাধির অনুপ্রবেশ কেন? কারণ শরীরের রোগ প্রতিশোধক শক্তি কমে যাওয়া। এজন্য দেখা যায় সাধারণ জলবায়ুর পরিবর্তনেই শরীরের উপর তার কু-প্রভাব পড়ে। সর্দি, কাশি, জ্বর দ্বারা হামেশাই আক্রান্ত হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারবাবু বলেন, ভাইরাল। এর অর্থ হল প্রকৃতিতে যে হাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরীর চলতে পারছে না, প্রতিশোধক শক্তির অভাব। এই শক্তির অভাবের জন্য ভাইরাস তার প্রভাব বিস্তার

করেছে তারই ফলশ্রুতি সর্দি কাশি, জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। এর জন্য ডাক্তারবাবু দুটো জিনিস দেন। অ্যান্টিবায়োটিক ও ভিটামিন। আর তিনটে বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। প্রথমত সঠিক পুষ্টির খাবার খেতে হবে অবশ্যই সব্জি ও ফল যেন থাকে। দ্বিতীয়ত বিশ্রাম ঠিক যেন হয়। তৃতীয়ত ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে। এই তিনটি বিষয় দ্বারা অবশ্যই রোগ প্রতিশোধক শক্তি বাড়বে। ঠিক এভাবে মানসিক অস্থিরতা বা টেন্‌শন্ জীবনে প্রবেশেরও কারণ আছে। যখন মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায় তখন ছোটখাট ঘটনা, ছোট ছোট পরিস্থিতি ও সমস্যা ব্যক্তির মনকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। শারীরিক শক্তি কমে গেলে যেমন করে প্রকৃতির প্রভাবে শরীরের উপর পড়ে, ঠিক তেমনি মানসিক শক্তি কমে গেলে, সাধারণ পরিস্থিতি ও ঘটনা মনের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। একেই বলা হয় টেন্‌শন্। মানসিক প্রতিশোধক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন মাল্টি-ভিটামিন ক্যাপসুল কিংবা টেন্‌শন্ কমানোর জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিক্‌স নেই। মানসিক স্বাস্থ্যোদ্ধার কিংবা মানসিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য চাই সঠিক উপায়ে আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

মানসিক স্বাস্থ্যোদ্ধার কিংবা মানসিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য চাই সঠিক উপায়ে আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

স্বপ্ন হল সত্য

- ব্রহ্মাকুমার সন্দীপ
বাঁকুড়া

স্বপ্ন শব্দটাই বিস্ময়কর। কখনও উল্লাস তো কখনও আর্তনাদ। কখনও রাজা বানায়, কখনও বা ফকির। এভাবে নানা রূপ-রঙ মেখে স্বপ্ন হাজির হয় মনের আঙ্গিনায়। এই স্বপ্ন আমরা দু'ধরনের দেখে থাকি - এক, জ্ঞানতঃ বা চেতন স্তরে, দুই, অজ্ঞানতঃ বা অবচেতন স্তরে। অবচেতন স্তরের স্বপ্ন হঠাৎ নিদ্রিত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে আসে। কিন্তু চেতন স্তরের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় আমরা দেখে থাকি। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের জীবনে কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখেই থাকে। কেউ স্বপ্ন দেখে বড় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার, কেউ বড় রাজনীতিবিদ, আবার কেউবা ভালো অভিনেতা হওয়ার। এই স্বপ্ন কখনও সত্য হয় আবার কখনও বা মনের ভাবনার স্রোতেই ভেসে চলে যায়।

এবার আসি নিজের প্রসঙ্গে। আমিও আমার ব্যক্তিগত জীবনে বা স্টুডেন্ট লাইফ-এ দুটো স্বপ্ন প্রায়শঃই দেখতাম। এক, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা; দুই, ঈশ্বরদর্শন। প্রথম স্বপ্নটার বাস্তব রূপদান আমার হাতে। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার পরিশ্রম ও আত্ম-প্রত্যয়ই এই স্বপ্নটাকে প্রাণদান দেবে আর শেষপর্যন্ত তা দিয়েছেও। কিন্তু দ্বিতীয় স্বপ্নটা যা সবথেকে বেশি অভিপ্রেত এবং যা বারে বারে মনে উঁকি মারতো তার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? উত্তর খুঁজে পাই না। বারম্বার মনে মনে বলতাম, ভগবান তুমি যদি সত্য হও তবে সামনে এসো, মায়ার যবনিকা সরিয়ে দাও। মনের আওয়াজ ওই মনের কাছে পৌঁছায়। আর আওয়াজ পেতেই তিনি চলে আসেন আমার একদম কাছে। এসেই আমার অজ্ঞানতার কালো পট্টির বাঁধনটা চোখ থেকে খুলে দেন। পরিয়ে দেন জ্ঞানের সুন্দর সোনালি ফ্রেমের চশমা। এই চশমা পরে দেখছি এক অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য দৃশ্য যে আমার সেই দ্বিতীয় স্বপ্নটা (ঈশ্বরদর্শন) আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জ্ঞানচক্ষুতে আমি দেখছি যে সম্মুখে বিরাজমান স্বয়ং নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু শিব পরমাত্মা, যাঁকে পাওয়ার জন্য কত জন্মই না স্বপ্ন দেখেছি। এই স্বপ্নটা শুধু এই জন্মের নয়, এটা জন্ম-জন্মের স্বপ্ন যা এতদিন অপূর্ণই ছিল। কিন্তু আজ সেই স্বপ্ন হল সত্য।

পশুহত্যা নিষ্ঠুরতা

- ব্রহ্মাকুমারী এঞ্জেলা

বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য কিছু বিধান তৈরি করেছেন। এই বিধান অনুযায়ী চললে তবেই আমরা জন্ম-জন্মান্তরের জন্য শান্তি পেয়ে থাকি। নাহলে জুটবে আমাদের কপালে শাস্তি। ভারতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য অহিংসা। কিন্তু এই ধর্মের কথা আমাদের মনে থাকে না। তাই অজ্ঞানবশতঃ মানুষ নিরীহ পশুকে হত্যা করে চলেছে, তৈরি হয়েছে কসাইখানা। এই কসাইখানায় আশ্রিত হাজার-হাজার নিরীহ পশুকে কেবলমাত্র রসনাতৃপ্তির জন বলি দেওয়া হয়। এভাবে নিরীহ পশু হত্যার শাস্তি মানুষকে পেতে হয় প্রকৃতির বিধানেই।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভোজন করা যজ্ঞ করার সমান। আমরা যে পরিবেশে থাকি সেই পরিবেশ আমাদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যেরকম আহার করি সেরকম আমাদের মন তৈরি হয় এবং সেই অনুযায়ী আমাদের চিন্তা ও বিচারশক্তি আসে। এজন্য ইংরেজিতে বলে - "as you think so you become." অর্থাৎ যেমন তুমি ভাববে তেমনই তুমি হবে। আমরা আমাদের ভাবনা অনুযায়ী কর্ম করি। এই ভাবনা শুদ্ধ রাখতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ অন্ন না খেলে শুদ্ধ মন তৈরি হয় না। নিরামিষ আহারকেই শুদ্ধ আহার বলা হয়। ইতিহাস বলছে বহু শিল্পী, পণ্ডিত, দার্শনিক, এমনকি বৈজ্ঞানিকও নিরামিষ আহার গ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন - দার্শনিক সক্রেটিস, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, নিউটন, কবি শেলী, মহাবীর, বুদ্ধদেব, গান্ধীজি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম আজাদ, ঈশাই ধর্মের প্রচারক পিটার, ম্যাথু - এঁনারা সকলেই ফলাহার ও নিরামিশ আহার পছন্দ করতেন। প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা মনে করতেন পশুর মাংস মানুষের সদ্‌বিবেচনার অন্তরায়। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতরা, পারস্যের পুরোহিতরা মাছ-মাংস খেতেন না। গীতায় খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে - সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এবং নিরামিষ খাদ্যকেই সাত্ত্বিক আহার বলা হয়েছে। যাঁরা সাত্ত্বিক আহার করেন তাঁরা রাগদ্বেষহীন, অহংকারশূন্য ও সুবিবেচক হন।

মানব জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। মানুষের মধ্যে মানবতা না থাকলে সে মানব নাম কিভাবে নেবে? Man = Animality + Rationality. মানুষের মধ্যে মানবতা নষ্ট হয়ে গেলে তার সঙ্গে পশুর কোনো পার্থক্য থাকে না। মানুষ নিজের পেটের জন্য কোনো দুর্বল প্রাণীকে হত্যা করতে পারে না। বলা হয়, মানুষের দেহ হল মন্দির, কিন্তু দুর্বল প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে আজও কি তা মন্দির আছে? যে পশুকে আমরা পালন করি, আদর করে খাওয়াই তাকে হত্যা করতে আমাদেরর হাত কাঁপে না? এতটুক কষ্ট অনুভব হয় না? প্রায় সব দেশে, এমনকি ভারতবর্ষের পশুদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা আছে। কেউ যদি পশুর ওপর অত্যাচার করে, ঘোড়াকে যদি দেখা যায় তার কোচোয়ান খুব চাবুক মারে তবে সেই সংস্থা থেকে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থাটি হল SPCA (State Preventation of Cruelty to Animals).

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ এমন নিয়ম করেছে যে যতক্ষণ সে অন্য কাউকে না খাওয়ায় ততক্ষণ নিজে খায়না। হয়তো সকালে উঠেই কেউ এজন্য কুকুরকে খাওয়ায়, কেউ পায়রাকে খাওয়ায়, কেউ বিড়ালকে খাওয়ায়, কেউ আবার কাককে খাওয়ায়। এসব প্রথার পিছনে আছে মূক প্রাণীর প্রতি মঙ্গল ভাবনা। মূক প্রাণীকে হত্যা করা মহাপাপ। শুধু তাই নয় এদেরকে মারাও অন্যায়। বিদেশে এরকম নিয়ম আছে যে কোনো পোষা প্রাণীকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না। পশু হত্যা পৈশাচিক বৃত্তির বিকাশ। ভোজন ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও জিভে কয়েক মিনিট স্বাদের জন্য আমি অপরের জীবন নষ্ট করতে পারি

না। অকাল মৃত্যু আমরা কেউই চাই না। আমরা ফলমূল, শাক-সবজি খাই। উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলা হয় কিন্তু উদ্ভিদের চেতন সত্তা আত্মা নেই। কর্তিত বৃক্ষ আবার বেঁচে উঠতে পারে কিন্তু হত জীবকে আর বাঁচান যায় না। ভারতীয় যোগীরা কখনও জীবহত্যা পছন্দ করতেন না। এজন্য বলা হয় - "Live and let live."

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ''মাতা পশুর দুধ থেকে বাছুরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে''-যেদিন থেকে এই বাক্য উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন থেকে দুধ বা দুধের তৈরি যে কোনো জিনিস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই এধরনের ব্যক্তিদের কাছে পশু হত্যা করে তার মাংস খাওয়া কতটা হৃদয়বিদারক।

ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাদের খাদ্য হিসাবে ফল, শস্য, শাক-সবজি দিয়েছেন। এই উদ্ভিদ জগৎ থেকে আমরা সবরকম পুষ্টিকর উপাদান পাই। পশু-পাখি মেরে হিংস্রতা, নির্দয়তা দেখানো পাপ। আমরা যখন কারোর জীবন দিতে পারি না তখন তার মূল্যবান জীবন কেন নষ্ট করবো? কোন পশুকে হত্যা করার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তার মধ্যে ভয় তৈরি হয়। তারপর আসে ক্রোধ। তখন সে চীৎকার করে, এমনকি চোখ দিয়ে জলও পড়ে। তার বড় বড় চোখের চাউনি দেখে তা বোঝা যায়, কারণ, সে মূক - তার ভাষা নেই। সে-সময় তার শরীরের ভেতর একপ্রকার নিঃসরণ হয় এবং তা তার রক্তের সঙ্গে মিশে বিষ উৎপন্ন করে। এজন্য মাংস সহজে হজম হয় না। কিন্তু নিরামিষ আহার সহজপাচ্য। পশুর মূত্রে যে Uric Acid আছে তার থেকে বেশি Uric Acid আছে তার মাংসে। ফলে সেই মাংস যখন আমরা খাই তখন আমাদেরও Uric Acid বাড়ে। এছাড়া আমেরিকার Life Style Institute-এর এক Doctor বলেছেন এমন কোন বাঁদর দেখা যায় না, যার heart disease হয়েছে বলে শোনা গেছে। কারণ, তারা নিরামিষ খায়। চোখের সামনে জীবহত্যা অনেক মানুষের নৈতিক বোধকে কষ্ট দেয়, অনেকের অন্তর কাঁদে। এটা ভুললে চলবে না যে প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। কোন সভ্য মানুষকে কসাই বললে সে রেগে যায়, কেউ চাইবে না কোন জল্লাদ তার বন্ধু হোক। এই নিরীহ জীবহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে মানুষ আজ নিজেদের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি করছে। বিধাতার রাজ্যে এই অন্যায়ের শাস্তি থেকে মানুষ কখনও রেহাই পায় না।

'বলি মানে কোনো পশুকে ধরে বলি দেওয়া নয়। তোমাদের মধ্যে যে পাশব প্রকৃতি, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ আছে অর্থাৎ ষড়রিপুকে বলি দাও।'

আমাদের পূজা পদ্ধতিতে বলি প্রথা প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধদেবও প্রচলিত পূজাপদ্ধতিকে প্রাণহীন, নিষ্ঠাহীন বলেছেন। আমরা অনেক কিছু ভাবি না বা অনুভব করি না, তাই মা কালীর সামনে জীবহত্যা করে সেই বলি দেওয়া মাংসকে মহাপ্রসাদ বলি এবং মনে করি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশাল আশীর্বাদ পেলাম। মা কালী জিভ দেখিয়ে বলেন, 'তোমরা আমার সৃষ্ট জীবকে বলি দিয়ে সেই মাংস খাইয়েছো, মনে করো। এই দেখো আমার জিভ, আমি বলি দেওয়া মাংস খাই না। আসল বলির অর্থ তোমরা জান না - বলি মানে কোনো পশুকে ধরে বলি দেওয়া নয়। তোমাদের মধ্যে যে পাশব প্রকৃতি, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ আছে অর্থাৎ ষড়রিপুকে বলি দাও।'

উপসংহারে এসে বলি, সমাজের ও জীবকুলের মঙ্গলের জন্য, জীবনে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা আনয়ন করার জন্য পশুবলি দূর হওয়া দরকার । এই জন্য বলা হয় - জীবে প্রেম করে যেই জন / সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

পেশার প্রসঙ্গ ও বাবার শিক্ষা

- ব্রহ্মাকুমার শিবু
কলকাতা (পিকনিক গার্ডেন)

বাবা হিরে সুরক্ষিত রাখার পাত্র সম্বন্ধে বলেন, বৎস, হিরে সুন্দরভাবে রাখার জন্য সুন্দর ও দামি বাক্সের প্রয়োজন হয়। হিরের মূল্য যেমন হবে সেই অনুসারে বাক্সও মূল্যবান হওয়া চাই। এবার ভেবে দেখো ভগবানের থেকে যে অমূল্য জ্ঞান রত্ন পাচ্ছ তার জন্য বুদ্ধিরূপী সিন্দুক বা বাক্স কতখানি রয়্যাল হওয়া চাই? হিরের গহনা দিয়ে যারা নিজেকে সাজায়, দেখেছ তাদের ওঠা-বসা কত রয়্যাল? যেখানে তোমাদের রাজারও রাজা পরমপিতা পরমাত্মার নিকট থেকে জ্ঞানরত্ন বা বলা যায় অবিনাশী হিরে পাচ্ছ। সেখানে তোমাদের চালচলন, মন-বচন-কর্ম কতখানি ঈশ্বরীয় কুলের অনুকূল হওয়া চাই? যদি ঈশ্বরীয় মর্যাদার অনুকূল না হ'তে পারো তাহলে কিন্তু বুদ্ধিরূপী সিন্দুকে তালা পড়ে যাবে। নীটফল তোমার খুশি উধাও হয়ে যাবে।

বাবা বলতেন, হিরের গুণগত মানের উপর তার মূল্য নির্ধারিত হয়। তার নামও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। কিছু হিরে হয় ত্রুটিযুক্ত আর কিছু হয় ত্রুটিমুক্ত। ত্রুটিমুক্ত হিরেকে অনেক মান ও দাম দেওয়া হয়। এই জ্ঞানমার্গে যে বাচ্চার মধ্যে কোন না কোন দুর্বলতা, ত্রুটি, আসুরী লক্ষণ থাকে তাকে কম মূল্যবান হিরে হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যে বাচ্চা পবিত্র হৃদয়ের, নিখুঁত ত্রুটিমুক্ত তাকে মূল্যবান হিরে হিসাবে গণ্য করা হয়। এরূপ বাচ্চা বিষ্ণুর গলার মালার রত্নে পরিণত হয়। বাবা নবরত্নের প্রসঙ্গ এনে বলেন, দেখো, শিববাবার জ্ঞানপ্রাপ্তকারী সব বাচ্চাই রুহানি রত্ন কিন্তু ঈশ্বরীয় 'জ্ঞান' ও 'যোগ' অনুশীলনকারী যে বাচ্চারা বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয়েও লোককল্যাণে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং অন্যের অবিনাশী সুখের জন্য জীবনপাত করে তারাই 'নবরত্ন' রূপে গণ্য হয়। যাদের গায়ন আজও পর্যন্ত চলে আসছে। দুনিয়াতে কোন বিঘ্ন থেকে মুক্তি পেতে, সুখ পেতে নবরত্নের স্মরণার্থে স্থূল নবরত্নের আংটি পরিধান আজও সমানভাবে চলছে। বাবা হিরে-জহরতের পেশার প্রসঙ্গ টেনে স্নেহের সুরে বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, দেখ, প্রতিটি বাচ্চাকে দেখতে চাই ঈশ্বরীয় জ্ঞান গ্রহণ করে যেন সম্পূর্ণ হয়, কারো মধ্যে কোন দুর্গুণ বা ত্রুটি যেন না থাকে, ত্রুটি থাকলে বিষ্ণুর গলার মালার মণি হতে পারবে না। নিজেকে প্রশ্ন করো, আমি যজ্ঞে আসা বিঘ্নের মোকাবিলা করছি, নাকি নিজেই বিঘ্নের কারণ হচ্ছি? যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে, অসহনীয় বিষয়কে সহন করে, নিজের জীবনকে বাজি রেখে, মনুষ্যাত্মার অলৌকিক সেবায় দধীচি মুনির ন্যায় হাড়-দানের বিনিময়ে সুখশান্তি প্রদানের মহান কর্ম যদি করতে পার তাহলে অবশ্যই'নবরত্নে' তোমাদের স্থান হবে।

কসাই ঃ বাবা বলতেন, মাংস বিক্রেতা বা কসাইয়ের জীবিকা বড় হৃদয়হীন হয়। কসাই জীব হত্যার দোষে দোষী। কিন্তু যদি জ্ঞানচক্ষুর নিরিখে দেখা যায় তাহলে দেখবে 'কামকাটারি' চালনাকারীও কসাইয়ের চেয়ে কম নিষ্ঠুর বা হৃদয়হীন নয় বরং তাদের চেয়েও অধিক পাপী এবং দোষী। কসাই কোন জীবকে একবার হত্যা ক'রে এক জন্মে দুঃখ দেয় কিন্তু কামুক ব্যক্তি বারংবার কামকাটারি চালিয়ে আত্মাকে হনন করে। একেই নরকের 'প্রবেশপথ' বলা হয়। কামকাটারি হজমকারীও নরকগামী হয় অর্থাৎ অধঃপতনের দিকে গতি তার তীব্র হয়। কামকাটারির দ্বারা মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আদি-মধ্য-অন্ত এই তিনকালের দুঃখ পেয়ে থাকে।

বাবা বলেন, কেবল জীব হত্যাকারী এবং তার মাংস বিক্রেতাই কেবল পাপের ভাগীদার হন না। যে ব্যক্তি ঘরে মাংস নিয়ে আসে, যে ব্যক্তি রান্না করে, যে ব্যক্তি তা ভোজন করে তারা সবাই পাপের ভাগীদার হয়ে একই দোষে দোষী হয়। নীট ফল দাঁড়ায়, সে বুদ্ধি ভ্রষ্ট এবং বিবেকশূন্য হয়।

বাবা ক্রোধ সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বলেন, ক্রোধ এক রকম হিংসা যা কসাইয়ের সমতুল্য। কামুক এবং ক্রোধী এরা এমন জল্লাদ বা কসাই যারা অন্যকেই শুধু হত্যা করে না হিংসার আগুনে নিজের মানবিকতা এবং 'পবিত্র আত্মিকভাবকে' হত্যা ক'রে দেহবোধকে প্রকট করে। দেহবোধ আত্মার পবিত্র বোধকে দমন করে কিংবা হত্যা করে কসাইয়ের কাজই করে।

স্বর্ণকার ঃ স্বর্ণকারের পেশার প্রসঙ্গ এনে বাবা বলতেন, প্রত্যেকটি স্বর্ণকার জানেন সোনা শুদ্ধ বা নিখাদ করার পদ্ধতি। সোনা দিয়ে যখন গহনা তৈরি করা হয় তখন সোনার মধ্যে কিছু অন্য ধাতু খাদ মেশাতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সোনাকে আবার নিখাদ করতে আগুনে ফেলে তকে গলাতেই হয়। সোনাকে গলিয়ে তার মধ্য থেকে খাদ সরিয়ে প্রকৃত সোনাকে আলাদা করা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা সবোচ্চ স্বর্ণকার। তিনি যোগভাট্টিতে আত্মাদের রেখে যোগাগ্নির সাহায্যে অপবিত্র সংস্কাররূপী খাদকে আত্মা থেকে পৃথক করে আত্মাকে পবিত্র করে দেন। শিববাবা আত্মার পবিত্র ও অপবিত্রতার অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাত করেছেন। সৃষ্টির আদিকালে অর্থাৎ সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগে আত্মা ১৬ কলা সম্পন্ন সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল, নিখাদ ছিল। ২৪ ক্যারেট সোনার সমান শুদ্ধ ছিল। এরপর ত্রেতাযুগ এসে গেল যাকে রজতযুগ বলা হয়। এই শুদ্ধ আত্মার মধ্যে খাদরূপী রূপোর মিশ্রণ হল। ফলস্বরূপ আত্মার গুণগত মান ১৪ কলা পবিত্র অর্থাৎ ১৪ ক্যারেট সোনায় পরিণত হল। তারপর এল দ্বাপর যুগ। এই যুগে কাম, ক্রোধ সহ অন্যান্য বিকাররূপী তামা আত্মাতে খাদ রূপে মিশে গেল, বলা যেতে পারে বিকারের প্রলেপ পড়ে গেল। আত্মা ৮ কলায় পরিণত হল অর্থাৎ ৮ ক্যারেট সোনার সমান হয়ে গেল। এরপর কলিযুগ এসে গেল, যাকে লৌহযুগও বলা হয়। এই যুগে আত্মায় এতটাই তমোগুণের আধিক্য হল যে এখানে আত্মাকে সোনা না বলে লোহা বলাই সমীচীন হবে। কারণ আত্মা সম্পূর্ণ অপবিত্র হওয়াতে বুদ্ধিভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট ও কর্মভ্রষ্ট হয়ে মূল্যহীন হয়ে যায়।

কলিযুগ এসে গেল, যাকে লৌহযুগও বলা হয়। এই যুগে আত্মায় এতটাই তমোগুণের আধিক্য হল যে এখানে আত্মাকে সোনা না বলে লোহা বলাই সমীচীন হবে। কারণ আত্মা সম্পূর্ণ অপবিত্র হওয়াতে বুদ্ধিভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট ও কর্মভ্রষ্ট হয়ে মূল্যহীন হয়ে যায়।

মানুষ সত্যযুগে যখন ২৪ ক্যারেট স্বর্ণতুল্য ছিল তখন তাঁর স্বর্ণতুল্য পবিত্র শরীর লাভ হত। সতোপ্রধান গুণগত মান থাকায় ওই সময়কার মানুষকে 'দেবীদেবতা' বলা হত। মানুষের মূল্য তখন এতটাই ছিল যে ওই সময়ের তাঁদের রূপের জড়মূর্তি আজও পর্যন্ত লাখ-লাখ টাকা ব্যয় করে মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। অথচ আজ অনেক মানুষের মাথা গোঁজার মতো ঝুপড়িও সবার কপালে জোটেনা। পথের বেওয়ারিশ পশুর মত এদিক সেদিক পড়ে থাকে। আজ কী নিদারুণ মানুষের অবস্থা হয়েছে। কোথাও কোথাও পশু, মানুষ, ময়লার ভ্যাট নিয়ে সম অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। আজ ভারতের কী হাল হয়েছে, যে ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। সোনার ভারত ছিল। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী ছিল। সেই সোনার ভারত

পরবর্তী অংশ আঠার পাতায়

বাবাকে চেনার আলোকে মাম্মাকে চেনা

- ব্রহ্মকুমার স্বপন
কলকাতা (মিউজিয়াম)

প্রথমে আসি ১৫ই মার্চ বাবার হোলি উৎসবের অবতরণের সময়কার অনুভবে। কী দেখলাম, কী শুনলাম, কী অনুভব করলাম! অবিশ্বাস্য! কী প্রচণ্ড হতাশ মনোভাব নিয়ে গিয়েছিলাম, কি প্রচণ্ড নেগেটিভ চিন্তাধারা নিয়ে গিয়েছিলাম! আমার সমস্ত নেগেটিভ চিন্তাধারার স্রোত তাঁকে ছুঁতে পর্যন্ত পারলো না। উল্টে আমায় দেখিয়ে দিলেন, শুনিয়ে দিলেন, অনুভব করিয়ে দিলেন - কী প্রচণ্ড শক্তিশালী তাঁর পজিটিভ চিন্তাধারার স্রোত! কী প্রচণ্ড শক্তিশালী তাঁর পজিটিভ ভালোবাসার স্রোত! তা না হলে তিনি একা এই পূতিগন্ধময় নরককে বদলে দিতে পারেন! তা নাহলে তিনি ভাসিয়ে দিতে পারেন - তাঁর ভালোবাসার জনদের! ভাসিয়ে দিয়ে আলাদা করে চয়ন করে নিতে পারেন সবার মধ্য থেকে! তারপর সেই ভালোবাসার শক্তি দিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে! শুধুই পজিটিভ এনার্জি! শুধুই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার স্রোত! ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য তুমি! ধন্য আমি, ধন্য আমি, ধন্য আমি! এটা প্রত্যক্ষ করতে পেরে - প্রত্যক্ষ না করলে অনুভবও হতো না। Thank you বাবা !Thank you বাবা !Thank you বাবা !

এখন আসি মাম্মার কথায়। উপরোক্ত অনুভূতির আলোয় মাম্মাকে নতুনভাবে চেনা গেল। এতদিন ঠিক ব্যক্ত করতে পারতাম না - মাম্মার চিত্র আদি থেকে যে অনুভূতি হোত তা ঠিক কী রকম? মাম্মা একটা Enigma - একটা বিস্ময়। এককথায় বলতে গেলে "সূর্যের ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রমার মধুরিমায় ঘেরা।" যে ব্যক্তিত্বের সামনে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি অবাক বিস্ময়ে এবং মুগ্ধতায় বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। যার মধ্যে ঢুকে যান জ্ঞানযজ্ঞে বিরোধী শক্তিগুলোর সম্মিলিত আরোপগুলি বিচার করার 'বিচারক' ও ওই দিন উপস্থিত সারা আদালতের জনসমূহ। সেই মাম্মা যিনি তখন 'রাধে' নামে পরিচিত। সেই অনূর্ধ্বা ২০ বর্ষের কোন নামকরা university থেকে Doctorate ডিগ্রি না পাওয়া এক সহজ সরল কন্যার সহজ সরল যুক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে।

মাম্মার অত্যাশ্চর্য আচরণ স্থিতি এবং বাণী বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল তাঁর থেকে জাগতিক বিষয়ে বেশি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁর থেকে কিছু তরুণ দুই যুবককে - আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় দুই যজ্ঞভ্রাতা নির্বের ভাই আর রমেশ ভাই। যে ঘটনার উল্লেখ আমরা তাঁদের লেখায় পড়েছি এবং শুনেছি। মাম্মা বোম্বেতে রমেশ ভাইয়ের বন্দোবস্ত করা ঠিকানায় থাকতেন। সময়টা ছিল সন্ধ্যাবেলা - তাঁরা দুভাই ও মাম্মা রমেশ ভাইয়ের গাড়িতে কোন একটি সেন্টারে যাচ্ছেন। বোম্বের আকাশ তখন ঝলমল করছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যের নিওন লাইটে। মুরলীর ভিতরে বাবার যে সমস্ত দিকদর্শনগুলো আমরা শুনতে পাই, যেমন, বড় বড় দৃষ্টি আকর্ষণকারী চিত্র লাগাও বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জনসমাবেশ হয় বা লোক সহজে দেখতে পায়। চিত্রগুলি হবে রাজযোগের জ্ঞান সম্বলিত । যেমন, 'সৃষ্টিচক্র', কল্পবৃক্ষ, সিঁড়ি ইত্যাদি। বরিষ্ঠ ভাইদের প্রশ্ন ছিল, মাম্মা আপনি ওই নিওন লাইটগুলো দেখেছেন এবং এর বিজ্ঞাপন, যদি আমরা সেই রকম কিছু লাগাই? মাম্মার উত্তর ছিল -"আমি একমাত্র ক্লাসের সময় সবার উপর দৃষ্টি দিই - অন্য সময় আমার দৃষ্টি কোথাও থাকে না।" এমনও হতে পারে যজ্ঞের সেই আদি সময়ে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব ছিল না বা সেরকম কোন অর্থশালী প্রোমোটার ছিল না কিন্তু যা উপরোক্ত বরিষ্ঠ ভাইদের প্রভাবিত করেছিল তা হ'ল মাম্মার

অন্তর্মুখিতা। বাইরের জগতের হাজারো চাকচিক্য, প্রলোভন তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেলত না।

মাম্মা ছিলেন জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ স্টুডেন্ট - শিক্ষক যা বলছেন তা সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে কার্যে প্রতিফলিত করা - এই ছিল মাম্মার বৈশিষ্ট্য। মাম্মার দিনচর্যার প্রারম্ভ হোত মধ্যরাত্রি দুটো থেকে - সেই সময় থেকেই তাঁর অমৃতবেলা শুরু হয়ে যেত। অমৃতবেলার সেই মাঙ্গলিক ক্ষণে বাবার সঙ্গে তাঁর গভীরতম অশরীরী যোগ তাঁকে silence শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত করেছিল। যজ্ঞের প্রতিষ্ঠার জন্য, দিকে দিকে সেন্টার খোলার জন্য যে সমস্ত 'আদি রত্নদের' প্রয়োজন ছিল - সে ব্যাপারে মাম্মার অবদান ছিল সর্বাধিক। তাই বয়সে নবীন হলেও পরমপিতা পরমাত্মা তাঁকে 'যজ্ঞমাতা', 'মাম্মা' নামে অভিহিত করেছিলেন। যজ্ঞের সেই আদি সময় থেকেই মাম্মা যখন বয়সেও নবীন ছিলেন সবথেকে বড় গুণ যেটা মাম্মার ভিতর দেখা যেত তা হল 'শোনা' (বিভিন্ন রকমের সংবাদ) এবং তা হজম করা কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শুধু তাই নয় কেউ উত্তেজিত ভাবে মাম্মার কাছে কারুর নামে নালিশ করলেও সেই উত্তেজিত অশান্ত মনও শান্তি-প্রশান্তিতে ভরে যেত মাম্মার শক্তিশালী সান্নিধ্যে।

অমৃতবেলার সেই মাঙ্গলিক ক্ষণে বাবার সঙ্গে তাঁর গভীরতম অশরীরী যোগ তাঁকে silence শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত করেছিল।

২৪শে জুন অতুলনীয়া মাম্মার অব্যক্ত হওয়ার দিন কিন্তু তিনি আমাদের সকলের মনে যে অবিনাশী ছাপ রেখে গিয়েছেন, তা কোনদিনই মুছে যাওয়ার নয়।

ষোল পাতার পর

আজ কাঙাল। এবার প্রশ্ন হল, ভারতের এই হীনতম দুর্দশার কারণ কী? এর মূল কারণ হল পাঁচ বিকার যা ভারতের রাজত্ব এবং মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। ফলস্বরূপ ভারতের এই করুণ দুর্দশা, রিক্ত, শূন্য, কাঙালপনা।

সোনা ও সোনার মিশ্রণের বিষয় উল্লেখ করে ব্রহ্মাবাবা বলতেন, বৎস, স্বর্ণকার যেমনভাবে সোনা থেকে অন্য ধাতুকে পৃথক করার বিদ্যা জানেন তেমনি শিববাবা এরকমই একমাত্র স্বর্ণকার যিনি মনুষ্যাত্মাকে বিকাররূপী খাদ থেকে আলাদা করে আত্মাকে সোনার সমান শুদ্ধ করতে পারেন। প্রথমে তিনি জ্ঞানযোগের তপ্ত ভাট্টি তৈরি করেন তারপর সেই ভাট্টিতে মনুষ্যাত্মাকে ঢালেন। ব্যাস, আত্মা থেকে বিকারকে টেনে বার করেন। এবার ধর, কোন সোনাকে যদি ভাট্টিতে না ফেলা হয় তাহলে তা গলবেও না আর তার থেকে খাদও আলাদা করা যাবে না। মনুষ্যাত্মা যদি স্বর্ণকার শিববাবার হাতেই না আসেন অর্থাৎ নিজেকে যদি তাঁর উদ্দেশ্যে সঁপে না দেন তাহলে কীভাবে তিনি আত্মাকে বিষয় বিকার থেকে মুক্ত করবেন? মানুষ মুখে আজকাল কষ্টের তাড়নায় বলে, 'হে প্রভু, আমার বিষয় বিকার হরণ করে আমাকে পাপ মুক্ত করো।' কিন্তু বাস্তব চিত্র কী দেখি, না তারা নিজেকে সমর্পণ করে, না তারা যোগ ভাট্টিতে পড়ে। এরূপ সহজ সরল করে বাবা বুঝিয়ে বলতেন - বাছা, এখন নিজেকে খুব আন্তরিক ভাবে যোগরূপী ভাট্টিতে ফেলো কারণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে বিকর্ম করে এসেছো তার খাদ আত্মাতে মিশে আত্মা কালো হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন তাকে স্বচ্ছ করা। স্বচ্ছ করার একমাত্র উপায় যোগ-ভাট্টিতে ফেলে নিজেকে খুব করে তপ্ত করে গলানো।

গীতার ভগবান ভারতে এসেছেন

- ব্রহ্মাকুমার লক্ষ্মীকান্ত
শ্যামনগর

ভগবান সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। কেউ বলছেন, ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, আবার কেউ বলছেন তিনি নিরাকার, কেউ সর্বব্যাপী বলছেন; আবার কেউ মহান পুরুষকে ভগবান বলছেন - অনেকেই নামের আগে ভগবান শব্দ ব্যবহার করেছেন। নানা মতবাদের গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত হয়ে কেউ তাঁর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। ভক্ত ভগবানকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, তাঁকে পেতে চায়, কিন্তু উনি সর্বব্যাপী ভেবে, মন্দিরে, মসজিদে, পাহাড়-পর্বতে তাঁকে খুঁজে ফেরে - "কোথায় পাব তারে..." চলেছে অন্বেষণ।

সেজন্য গীতার ভগবান শিবকে স্বয়ং আসতে হয়, আপন পরিচয় দিতে। তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন সাকার ব্রহ্মার মাধ্যমে। তিনি নিরাকার বলেই সাকার মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। গীতায় দেওয়া আছে, ভগবান অজন্মা, অভোক্তা, অযোনিসম্ভূত। মাতৃগর্ভে তিনি জন্ম নেন না। শিবের আর এক নাম 'স্বয়ম্ভূ'। যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অনাচার-অবিচারে ছেয়ে যায়, মানব আত্মা তখন নিজেকে ও তার পিতাকে ভুলে মিথ্যা মায়ার প্রভাবে প'ড়ে বিভ্রান্ত হতে থাকে, পথ হারায় অবশেষে কলির শেষ সময়ে এক বিশেষ আত্মার শরীবরূপী রথে, ভারতের পুণ্যভূমিতে ভগবান অবতারিত হন। তিনি ওই আত্মাকেসাক্ষাৎকার করিয়ে, তার জন্মরহস্য ব্যক্ত ক'রে, আপন পরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাকে রচনা করেন। ব্রহ্মার মুখকমল দ্বারা তিনি সর্বশাস্ত্র শিরোমণি 'গীতা জ্ঞান' দান করেন।

এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আগমন বার্তা ব্রহ্মার (সাধারণ এক বৃদ্ধের তনুতে) মাধ্যমে ব্যক্ত হওয়ায়, তাঁকে মানুষ চিনতে পারে না। মূঢ়মতি মানুষ সাকারের মধ্যে নিরাকার ভগবানকে বুঝতে পারে না। তিনি বলেছেন, "জপ-তপ করে আমাকে পাওয়া যায় না, আমাকে আমার মত করেই পেতে হয়।" অর্থাৎ নিজেকে অমর-অবিনাশী জ্যোতিবিন্দু স্বরূপ আত্মা ভেবে, পরমধাম নিবাসী পরম আত্মা নিরাকার জ্যোতিবিন্দুকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করা, তবেই তাঁর স্নেহের স্পর্শ অনুভব হবে অন্তরে। তিনি ভারতের পুণ্যভূমিতে এসেছেন। সকল আত্মাকে অর্থাৎ সাধু, সন্ত, মহাত্মা, গণিকা, কুব্জাকেও তিনি উদ্ধার করে থাকেন। অনেকের ধারণা, আত্মায় কোন দাগ লাগেনা, আর পরমাত্মার নাম রূপ নেই। কিন্তু পরমাত্মা শিববাবা বলেছেন, আত্মা যেহেতু জন্মচক্রে আসে, তাই আত্মার মধ্যে সঙ্গদোষের প্রভাব পড়ে। আর পরমাত্মার নাম, রূপ, গুণ কর্তব্য ও ধাম সবই আছে। তাঁর শক্তি ও গুণের প্রকাশ মানব আত্মার মাধ্যমে হয়। তার মানে এই নয় যে মানবের মধ্যে ভগবান রয়েছেন। সূর্য আকাশেই থাকে। কিন্তু তার আলো জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে, তাই বলে কি সূর্য ঘরে প্রবেশ করেছে? পরমাত্মা 'শিব'-এর সত্য সনাতন ধর্মের স্থাপনার মধ্যদিয়ে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়। কারণ সনাতন ধর্মের বীজ হতে সব ধর্মের জাগরণ হয়ে থাকে। যা কল্পবৃক্ষে দেখান হয়। তিনি কল্পবৃক্ষে সৃষ্টির অনন্ত রহস্য ও তার মর্মার্থকে স্পষ্ট করেছেন। প্রচলিত ধারণার সূক্ষ্ম রহস্যগুলিও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

গীতার ভগবানই পতিত দুনিয়ায় আসেন। যেহেতু তিনি নিরাকার, জনম-মরণ রহিত, সদা পবিত্র থাকার ফলে পতিত আত্মাকে তিনিই পবিত্র করতে সক্ষম, মানব আত্মার পক্ষে যা সম্ভব নয়। পরমপিতা পরমাত্মাই 'পতিত পাবন'। নরকে তিনিই নরশ্রেষ্ঠ

নারায়ণ পদবাচ্য বানাতে গীতা জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

সত্যযুগে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের রাজত্ব। তাঁদের যথার্থ পরিচয় পরমাত্মা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ হয়েছেন। তিনি সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকার, পুরুষোত্তম রূপে রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। শ্রীরাধা পূর্বজন্মে মাম্মারূপে গীতাজ্ঞানের গুহ্য রহস্যকে জেনে পবিত্রতার আধারে, সর্বশক্তি অর্জন করেছিলেন। রাধা ও কৃষ্ণের স্বয়ম্বরের পর - রাধা হন শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণ হন শ্রীনারায়ণ। তখন উভয়ে রাজসিংহাসনে বসেন। তখন হ'তে সত্যযুগের বা স্বর্গের সময়কালের গণনা শুরু হয়।

আত্মাকে দেহ নিয়ে জনম-মরণের চক্রের আবর্তে আসতে হয়। তাই সতোপ্রধান অবস্থা থেকে সতো, রজ ও তম গুণের অধিকারী হয়ে স্বর্গের দেবতা থেকে সাধারণ মানবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যুগের সাথে নাম, রূপ ও গুণের তারতম্য ঘটে। সুতরাং সত্যযুগে ও দ্বাপরে একই শরীরে ও একই নামে থাকা সম্ভব নয়। এছাড়া দ্বাপরের পর কলিযুগ - যাকে কলহ যুগ বা নরক বলে। মানবরূপী গীতার ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বাপরে এসে থাকলে তিনি কি মানবকে নরকে নিয়ে যান? সবাই জানে দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে শ্রীকৃষ্ণের গীতাজ্ঞান দেওয়ার পর কলিযুগ এসেছে। এবার কোটি টাকার প্রশ্ন - গীতাজ্ঞানের লক্ষ্য কি সত্যযুগ আনয়ন নাকি নরকতুল্য কলিযুগ? প্রকৃত সত্য হল ভগবান মানবকে মুক্তি, জীবনমুক্তি দিয়ে স্বর্গে (সত্যযুগে) নিয়ে যান। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গের দেব-দেবীগণ কখনই নরকে আসেন না। দ্বাপর থেকে তাঁদের জড়মূর্তির পূজা হয়। ভক্তের মনোবাঞ্ছা নিরাকার ভগবান শিব অলক্ষ্যে থেকে পূরণ করেন। এ গূঢ় তথ্য স্বয়ং ভগবান শিব ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন।

গীতার ভগবান কোন ব্যক্তি নন। সর্বশক্তি ও সর্বগুণের যিনি উৎস, যাঁকে জ্ঞানসূর্য বলে, তিনি নিরাকার জ্যোতির্লিঙ্গম্ শিব।

কলিযুগে বিকারী আত্মার বিষ, একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা শিবই পান করতে সক্ষম, অন্য কোন দেব-দেবীর পক্ষে সম্ভব নয়। শিবের আর এক নাম তাই নীলকণ্ঠ। ইহা সাগর মন্থনের কাহিনিতে পাওয়া যায়। স্বর্গে যারা দেবী-দেবতা ছিলেন, তারাও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তেসাধারণ অবস্থায় এসে নিজেকে ভুলে গেলে, কলির অন্তে গীতার ভগবান শিব ভারতে অবতারিত হয়ে ওই আত্মাদের পুনরায় গীতা জ্ঞানের আলোকে চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে পুনরায় স্বর্গের দৈবীগুণ সম্পন্ন হওয়ার অধিকারী করেন।

গীতার ভগবান কোন ব্যক্তি নন। সর্বশক্তি ও সর্বগুণের যিনি উৎস, যাঁকে জ্ঞানসূর্য বলে, তিনি নিরাকার জ্যোতির্লিঙ্গম্ শিব। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। সারা বিশ্বের আত্মাকে তিনিই আলোকিত করেন। যিনি মুক্তিদাতা, ভাগ্যবিধাতা, সর্ব আত্মার যিনি পিতা, এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার জ্যোতির্বিন্দুকেই বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ প্রমুখ ধর্মাবলম্বী 'ঈশ্বর' রূপে মানে। আর শ্রীকৃষ্ণকে 'লর্ড' রূপে মানে। গীতার ভগবান শিব প্রতি কল্পে পরমধাম হতে ভারতের পুণ্যভূমিতে মানব শরীররূপী রথে (প্রজাপিতা ব্রহ্মা) অবতারিত হয়ে সারা বিশ্বকে আলো দেখান। ভারত তাই পৃথিবীর লাইটহাউস। ব্রহ্মা 'মায়ের ভূমিকায়' থেকে নিরাকার পিতার পরিচয় দেওয়ায় অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, দেবতা শরীরধারী তাই সাকার, আর ভগবান তাঁর কোন নিজেব রক্ত-মাংসের শরীর নেই তাই তিনি নিরাকার।

চলো যাই পরমধাম

- ব্রহ্মাকুমার অভীক
হরিপাল, হুগলী

মানুষ মাত্রই ভ্রমণপিয়াসী। কার না ভালো লাগে রোজকার জীবনের একঘেয়েমি থেকে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে। দৈনন্দিন কাজের চাপে আর রুটিনে বাঁধা ছকবন্দি জীবন, তার ওপর আবার নানান টেন্‌শনে আমরা যেন বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি দিনে দিনে। নিজের ওপর নিজের আস্থা হারিয়ে ফেলছি - তাই না? মাঝে মাঝে এরকমও মনে হয় এই যান্ত্রিক সংসার-জীবন আর ভালো লাগছে না। কিন্তু সংসারী হয়ে তো সংসার ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ, তার জন্য চাই বাড়তি সময়, অর্থ ইত্যাদি। অফিস, আদালত, ব্যবসা থেকে বিরতি, সংসার থেকে ছুটি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে বিরতি তো রোজ মিলতে পারে না - কী তাই না?

আমাদের এই বেড়াতে যাওয়ার পিছনে মূল উদ্দেশ্য কী থাকে? আমার তো মনে হয় ঃ (১) দৈনন্দিন জীবনের নানান চাপ থেকে একটু শান্তি বা স্বস্তিলাভ; আর (২) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি। মানে অজানাকে জানা। অচেনাকে চেনা।

বহু অর্থ ব্যয় করে তো আমরা পৃথিবীর নানান জায়গায় বেড়িয়ে থাকি। কিন্তু সেই বেড়ানো তো অল্পদিনের জন্য। চলুন না যাই, পরমধামে/শান্তিধামে। যেখানে স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। পরমপিতা পরমাত্মা শিব ওখানেই আছেন। সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, জ্ঞান, পবিত্রতা ও শক্তির সাগর তিনি। কার না ভালো লাগবে তার দেখা পেলে! যারা আগ্রহী হলেন, তাদের অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন এসে গেছে - কি তাই তো? প্রশ্নগুলো এরকম হওয়াই স্বাভাবিক ঃ (১) পরমধাম - কোথায়? (২) কী আছে ওখানে? (৩) যাবো কীভাবে? ব্যয়ই বা কত হবে? (৪) কী পাবো ওখান থেকে?

প্রথমেই বলি আমরা তো মনুষ্যলোকে বসবাস করি। আমাদের দৃষ্টি নীল আকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই নীল আকাশ ভেদ করলে সূক্ষ্মলোক আছে। যে লোকে পরমপিতা পরমাত্মা কল্যাণময় শিব সৃষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের বাস। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় - এই তিনকার্য সম্পাদনের জন্য তাঁরা নিজ নিজ আসনে আসীন। এই সূক্ষ্মলোক ভেদ করলে লাল-সোনালি রংয়ের এক পরলোক রয়েছে - সেটাই পরমধাম বা শান্তিধাম।

এই পরমধামেই পরম করুণাময় শিব এক নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু ও অবিনাশী শক্তিরূপে বিরাজমান। তিনি সকল আত্মার পরমপিতা ও দেবতাদেরও জন্মদাতা - তাই তাঁকে দেবেশ্বরও বলে।

যারা আগ্রহী হলেন পরমধামে যাবার জন্য তাদের বলি - আমাদের দেহাভিমান কাটিয়ে নিজেদের আত্মারূপে ভাবতে হবে। মনে করতে হবে আমি আত্মা - এক জ্যোতির্বিন্দু - দুই ভ্রুকুটির মধ্যে আছি - আমার স্বধর্ম শান্তি। এরকম ভাবনার পাখায় ভর করে জ্ঞাননেত্র খোলা রেখে মনে করুন আপনি স্তরে স্তরে এগিয়ে চলেছেন পরমধামের দিকে। নিজেকে দেহী-অভিমানী করুন। অশান্ত বা চঞ্চল মন কখনও পরমাত্মার খোঁজ

পেতে পারে না। মন থেকে সব নেতিবাচক চিন্তা বাদ দিয়ে সততা ও পবিত্রতার সাথে এই চিন্তা করুন। এ থেকেই জন্ম নেবে এক দিব্যদৃষ্টি যার মাধ্যমে আপনি পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

মনুষ্যলোক থেকে পরমধামে যাবার উপায় হল সহজ রাজযোগ। এই সহজ রাজযোগ দ্বারা আপনি আপনার আত্মাকে পরমধামবাসী পরমাত্মার সাথে যুক্ত করতে পারবেন। আপনার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা থেকে নিয়মিত অল্প অল্প সময় বার করে ঈশ্বরীয় জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে সহজ রাজযোগের মাধ্যমে আপনি রোজই আপনার নিজগৃহ থেকে পরমধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন। এই শিক্ষা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় বিনাব্যয়ে বিশ্ববাসীকে প্রদান করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সকল আত্মার নিবাস হলো এই পরমধাম। পরমধাম থেকেই আত্মা একে একে মনুষ্যলোকে এসে স্থূলশরীরের মাধ্যমে এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে পরমধামে ফিরে যায়। আত্মার স্বদেশই হল পরমধাম।

প্রকৃতপক্ষে সকল আত্মার নিবাস হলো এই পরমধাম। পরমধাম থেকেই আত্মা একে একে মনুষ্যলোকে এসে স্থূলশরীরের মাধ্যমে এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে পরমধামে ফিরে যায়। আত্মার স্বদেশই হল পরমধাম।

নিয়মিত ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পঠন-পাঠন ও রাজযোগের অভ্যাস আমাদের আত্মাকে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন করে ও পঞ্চবিকার থেকে মুক্ত করে। এই জ্ঞানের দীপ যদি আমরা সকলে জ্বালাতে পারি তাহলে আমাদের আত্মা প্রজ্বলিত হয় ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয়। এই সান্নিধ্য থেকে যে সুখ অনুভূত হয় তা এক অনাবিল আনন্দের মোড়কে ঢাকা অতীন্দ্রিয় সুখানুভূতি। যা আমাদের জীবনকে পরমপিতা পরমাত্মার আশীর্বাদ ধন্য করে তোলে।

- যাত্রা সংক্ষেপ -

যাত্রী	ঃ দিব্যগুণসম্পন্ন ভাই ও বোনেরা।
যাবেন কোথায়	ঃ পরমধামে (পরমপিতা পরমাত্মা শিবের নিবাসস্থান)।
যাত্রারম্ভের প্রস্তুতি	ঃ নিজেকে আত্মা মনে করে অন্তর্মুখী হওয়া ও পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
যাবেন কীভাবে	ঃ ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের মাধ্যমে।
গাইড	ঃ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়।
ব্যয়	ঃ কোন অর্থ ব্যয় নেই। শুধু নিয়মিত সাধ্যমতন সময় বের করে করুণাময় শিবের সাথে যোগযুক্ত হওয়া।
প্রাপ্তি	ঃ মুক্তি - জীবনমুক্তি।

ষোলকলা সম্পন্ন হ'তে.....

লক্ষ্য ঃ আমি প্রসন্নচিত্ত আত্মা

প্রসন্নচিত্ত আত্মা তাঁকেই বলা হবে যিনি নিজের উপর প্রসন্ন, সবার উপর প্রসন্ন এবং সেবা করে প্রসন্ন। যদি এই তিন বিষয়ের প্রসন্নতা থাকে তাহলে বাপদাদাকে স্বতঃই প্রসন্ন করা সম্ভব। আর যে আত্মার উপর বাপ প্রসন্ন হন সেই আত্মা সদা সফলতাকে প্রাপ্ত করে থাকে।

যোগাভ্যাস -

১। নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে দেখো .... স্বয়ং ভগবান আমার .... তাঁর সবকিছু আমার হয়ে গেছে .... তিনি নিজের সব বরদান এবং সর্বশক্তি আমাকে অর্পণ করেছেন .... বাহ্! আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য .... এই অন্তিম জনমে আমার প্রতিটি পল ভগবানের সান্নিধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান সর্বসম্বন্ধের প্রেম আমাকে দিয়ে চলেছেন। সারা দুনিয়া যাঁকে ডাকছে, স্বয়ং তাঁর সত্য জ্ঞানামৃত আমি পান করে চলেছি .... আমি তাঁর ছত্রছায়ার অধিকারী হয়েছি।

২। আমি অকাল তখ্তে আসীন শ্রেষ্ঠ আত্মা .... যিনি নিজেকে অকাল তখ্তে আসীন শ্রেষ্ঠ আত্মা জ্ঞান করে চলেন তিনি বাপের হৃদয়ে সিংহাসনেও আসীন হন এবং ভবিষ্যতে রাজ্যসিংহাসনেরও অধিকারী হন।

৩। নিজেকে অকাল তখ্তে আসীন শ্রেষ্ঠ 'আত্মা' জ্ঞান করে পরমাত্ম মিলনের সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দরস আস্বাদন করে নাও, কারণ নিজেকে আত্মা ভাবলে না কোন দেহ, না কোন দেহের সম্বন্ধ, না কোন বৈভব তোমাকে প্রভাবিত করবে .... এক পরমাত্মা বাপই সংসার - এই 'ভাব' থেকে সর্ব সম্বন্ধের সুখ নাও।

আত্মচিন্তন -

স্বল্পকালীন প্রসন্নতা ও সদাকালের প্রসন্নতার অন্তর কী? অপ্রসন্নতার কারণ কী? সর্বদা প্রসন্ন থাকার উপায় প্রসন্নচিত্ত আত্মার লক্ষণ কী? প্রসন্নতার ভিত্তি কী ?

প্রসন্নতা ধারণ -

প্রতিটি পলে প্রসন্ন থাকতে হলে নিজের ব্রাহ্মণ জীবনের 'বিশেষতা'কে আন্তরিক ভাবে অবগত হয়ে তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে যে, কোন বিশেষতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করলে আরো অনেক বিশেষতা অর্জিত হয়।

নিজের জীবনে লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে, যা কিছু হোক না কেন যে কোন মূল্যে নিজের প্রসন্নতাকে ধরে রাখতে হবে। কারণ আমার প্রসন্নতাই হল সংসারের প্রসন্নতা। পরমাত্মার প্রত্যক্ষতার ভিত্তিই হল আমার প্রসন্নময় চেহারা, অতএব সর্বদা প্রসন্ন থাকতে হবে এবং সবাইকে প্রসন্ন করতে হবে।

তুমি এসেছ

- ব্রহ্মাকুমার বলরাম
ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা

সোনা রোদ
রূপালি জ্যোৎস্না
সুনীল আকাশ
সুবজ পৃথিবী।
আকাশ, বাতাস, পাহাড়-পর্বত
সাগরের অথৈ জল
পত্র-পুষ্প, ফুল, ফল
সোনার ফসল -
তোমার পরিচয় পত্র জমা দিয়েছে
গৈরিক চেতনার মানুষও।
সহজ, সরল, পবিত্র জীবনের সদর দপ্তরে।
তুমি আমাদের আত্মিক কুটুম্ব,
আহ্বানের আদেশনামা নিয়েই এসেছ -
তবুও অনেকে এখন চেনে না।
আমাদের পরিচয় পত্র জমা দিয়েছ
তোমাকে ডেকে এনেছে
আমাদের প্রবল, পবিত্র যোগাযোগ
তন্নিষ্ঠ যোগ -
রাজযোগ।
জ্ঞান, ভক্তির অন্তর্নিহিত নির্ঝর
অমৃত সুধাসাগর
অনন্য দোসর।
দিব্য জীবন নির্ভর।
তোমার আমার খবর জানাজানি হয়েছে -
ছবিসহ আমরা পেয়েছি -
অরূপের প্রকাশ রূপে
মন-বুদ্ধি-অন্তরের সদর দরজা খুলে
ভেতরবাড়ি পৌঁছে গেছ।
তোমার চলার শব্দ অমৃত বার্তা
তুমি শাশ্বত, অজড়, অমর সত্তা -
আমি আত্মা
তোমাকে চিনেছি
তুমি পরমপিতা
স্বয়ম্ভু শিব পরমাত্মা।

Vol.3, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2014, Price ₹10 only

কটক ঃ Student Personality Development Summer Camp কার্যক্রম উদ্বোধনে ভ্রাতা অক্রুর বারিক, প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর সর্বশিক্ষা অভিযান, কটক; বি. কে. কমলেশ ও অন্যান্যরা।

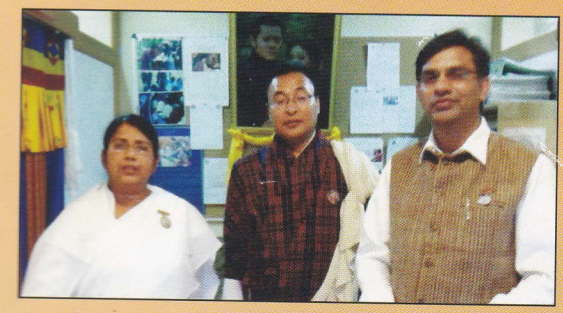

কুচবিহার ঃ ভূটান রাজার সেক্রেটারিয়েট ভ্রাতা তাসিজিকে ঈশ্বরীয় সন্দেশ ও উপহার প্রদান করছেন বি. কে. শম্পা ও বি. কে. ভানুভাই।

কলকাতা ঃ ঈশ্বরীয় সন্দেশ প্রদানের পর প্রণব কুমার দাসকে (এস. এস. পি.) ঈশ্বরীয় উপহার দিচ্ছেন বি. কে. চন্দ্রা।

আলিপুরদুয়ার ঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি পরিচালিত 'রক্তদান শিবির'-এ অংশগ্রহণকারী বি. কে. ভাইবোনেদের সাথে বি. কে. স্বপ্না ও বি. কে. সোমনাথ।

হলদিয়া ঃ ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দ্বারা আয়োজিত "স্ট্রেস ফ্রি লাইফ ফর ট্রাক ড্রাইভারস্" অনুষ্ঠানে ভাষণরত বি.কে. স্বপন - এর সঙ্গে উপস্থিত ভগিনী মোনা শ্রীবাস্তব, সিনিয়র ম্যানেজার, ভ্রাতা দিব্যেন্দু সেন, ডেপুটি ম্যানেজার, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।

বোমডিলা ঃ বোমডিলা সেন্টারে ঈশ্বরীয় পরিবারের সাথে বি. কে. কানন, বি. কে. অঞ্জলি, বি. কে. লক্ষ্মী ও বি. কে. অঞ্জনা।

তেজপুর ঃ তেজপুর সেন্টারে ঈশ্বরীয় পরিবারের সাথে বি. কে. গায়ত্রী ও বি. কে. কমলা, বি. কে. কানন, বি. কে. অঞ্জলি, বি. কে. মাধুরী ও বি. কে. অঞ্জনা।

Vol.3, Issue 2, RNI No.WBBEN/2012/42493, June - July 2014, Price ₹10 only

গুয়াহাটি ঃ "Destiny...Matter of Choice or Chance" সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনে বি.কে. শিবানীর সঙ্গে আছেন ভ্রাতা বিচারক এ. কে. গোস্বামী, ভ্রাতা বিচারক বি. কে. শর্মা (গৌহাটি উচ্চ আদালত), ভ্রাতা এ. কে. সিন্‌হা (কমিশনার, ইনকাম ট্যাক্স), ভ্রাতা অশোক বর্মা (ডিরেক্টর, এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া, গুয়াহাটি), ভ্রাতা রামনিরঞ্জন গোয়েঙ্কা (শিল্পপতি ও কবি), সরোজ খেমকা (প্রেসিডেন্ট, মহিলা মঙ্গল) এবং বি. কে. বেনারসী লাল, বি. কে. শীলা ।

কলকাতা (সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) ঃ পঃ বঃ ও সিকিম জিডিসি রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত "স্ট্রেস্ ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক অনুষ্ঠানে বি. কে. চন্দ্রা।

Printed & Published by Brahma Kumari Kanan on behalf of Owner, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya. Printed at Alpha Print House, 15E, Chowl Patty Road, Beliaghata, Kolkata-700010 and Published at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1A, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Editor's Name & Address: Samir Krishna Das, 11/2, West Road, Santoshpur, Kolkata-700075.